ভারতীয় বাহিনীর নব-জাগরণ

শ্রীসুধাংশু সেন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—উৎসর্গ—

আভার’শ সাতানকে—

4004

ভূমিকা

সাদা উপরওলাদের অসহ্য অন্যায় অবিচার অনাচার অব্যবস্থার প্রতিকার চেয়ে ভারতীয় নৌ-সেনার ধর্মঘটের চোখের পলকে "বিদ্রোহে"—জাতীয় সম্মান রক্ষার গৌরবময় "সংগ্রামে"—পরিণতি এবং দেখতে দেখতে সারা ভারতের বিক্ষুব্ধ জনগণের সক্রিয় সমর্থনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের উপর শেষ আঘাতের মত প্রচণ্ড ও অনিবার্য্য হয়ে ওঠা, ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস যখন ঘটনাবলীর ভয়ঙ্কর সমারোহের মধ্যে দিক্ পরিবর্ত্তন করে, অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে ছোট বড় অসংখ্য সংঘর্ষের মধ্যে প্রকাশ পায় শাসক ও শোষিতের শক্তির বিরাট ব্যাপক সংঘাত, তখন প্রতিটি ঘটনার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সমসাময়িক মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু ইতিহাসে এই নৌ-বিদ্রোহের স্থান যে কি হবে বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না।

ভারতের এই শেষ আঘাত শেষ আঘাতের মতই কেন বৃটিশ শাসনকে চুরমার করে দিল না, কেন মন্ত্রিমিশন, আপোষ, রোয়েদাদ, গৃহযুদ্ধের মধ্যে বিলম্বিত হয়ে গেল প্রকৃত স্বাধীনতার আবির্ভাব, এ জন্য দায়ী কারা, তাও ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হয়ে নেই। আমরাই জেনেছি।

একজন নৌ সেনার প্রত্যেক অভিজ্ঞতার বর্ণনায় নৌ বিদ্রোহের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিবরণটি ছোট—আমাদের সাধ মিটল না। আরও বিশদভাবে এই অপরূপ কাহিনী শোনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

২০. ১০. ৪৭ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের কথা

অনিভিজ্ঞতার দরুণ বইয়ের মাঝে মাঝে ছাপার ভূল রয়ে গেছে আশা করছি পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হবে। কিন্তু তা হলেও বইটা পড়ে সমস্ত ঘটনাটা বুঝতে কোনরূপ অসুবিধা হবে না এই আমার বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় মাণিক বন্দোপাধ্যায় ভূমিকা ও সাংবাদিক অজিত রায় ভারতীয় বাহিনী ও বৃটিশ নীতি এই প্রবন্ধটি লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। অবশেষে যাঁদের সাহায্য ও উৎসাহ না পেলে এই বই লেখা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব হ'ত না তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৬৭।১, সারপেনটাইন লেন,
কলিকাতা
১৫ই পৌষ ১৩৫৪

সুধাংশু সেন

ব্যাক বে
ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস
জি-পি-ও
ফোর্ট ব্যারাক
চার্চগেট স্টেশন
টাউন হল
ক্যাসল ব্যারাক
ট্রাম ডিপো
তাজমহল
তলোয়ার শিবির
এ্যাপোলো বন্দর
নোঙর-করা জাহাজ
সুরক্ষিত দ্বীপ
আরব সাগর
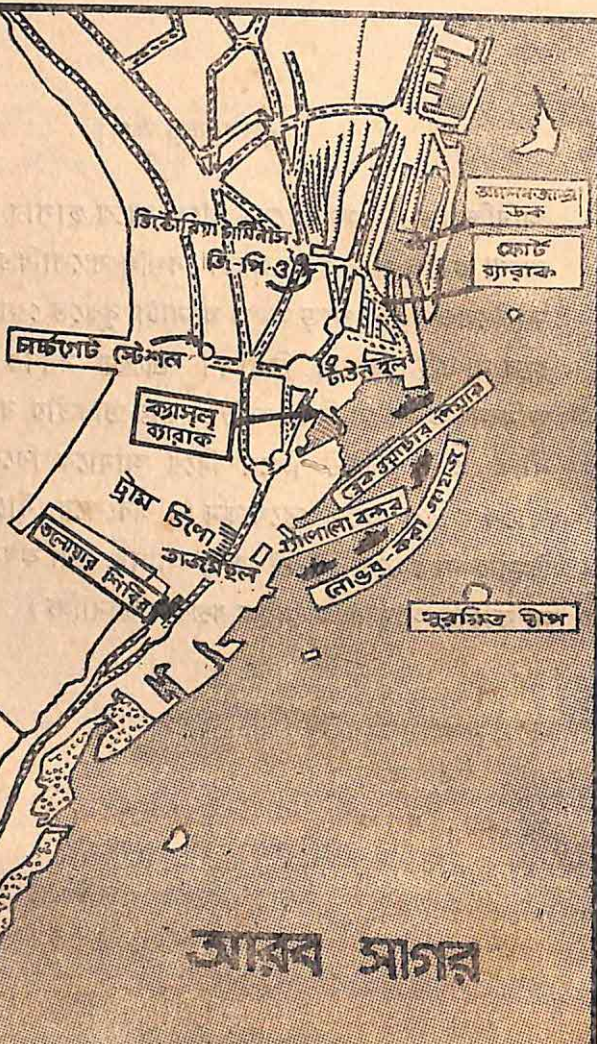
[বোম্বাই]

মিলিটারীতে প্রথম ঢুকবার দিনটা মনে পড়ে। রিক্রুটিং অফিসে কী আদর যত্নের ঘটা। নৌ-বহরে তখন লোক নেওয়া হচ্ছিল। অগত্যা 'নেভি'তেই যেতে হ'ল।

অফিসাররা কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে না। চেয়েছিলাম মেকানিক্যাল লাইনে যেতে, কিন্তু অবস্থার ফেরে হ'লাম ওয়্যারলেস্ অপারেটর। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোককে জানি—তাঁরা বিমান-বাহিনীর ক্যাডেট হবার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বণ্ড সই করার পর দেখলেন তাঁদের সাধারণ মিস্ত্রির কাজ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা তো রেগে আগুন। কিন্তু ক'রবেন কী? মিলিটারীর পনেরো আনা লোককেই এমনি ঠক্‌তে হয়েছে।

বণ্ড সই করার পর আমাদের রেস্টহাউসে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রেস্ট্-হাউস তো নয়, যেন জেলখানা। ছোট্ট ছোট্ট তাঁবু স্যাঁৎসেঁতে

মাটির ওপর দড়ির খাট, তার ওপর চটের ছালার মত কম্বল। রাত্তিরে একটা লণ্ঠন দিত—ঘণ্টা তুই মিট্‌মিট্ ক'রে জ্ব'লে নিভে যেত। তাছাড়া দিনের মধ্যে পাচ-ছ'বার কারণে অকারণে প্যারেড। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম চারপাশের মানুষগুলো কেমন যেন বদ্‌লে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিম্নস্তরের আলোচনা—আর চালচলনে, কথাবার্ত্তায়, অসামঞ্জস্যে সবাই পুরোদস্তুর 'মিলিটারী' হ'য়ে উঠেছে।

বৃটিশ সৈন্যদের রেস্ট-হাউস দে'খেছি—আমাদের তুলনায় সে সব রেস্ট-হাউস যেন স্বর্গ।

দিন সাতেক পর বদ্‌লির হুকুম এলো। পায়ে দেড় মণ ভারী বুট জুতো, গায়ে মোটা বে-মানান খাকী পোষাক—খটাখট্ বুটের শব্দে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম কাঁপছে। রংরুটের দল চলেছে।

ট্রেন থেকে নেমে বোম্বাইয়ের নৌ-অফিস খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু অফিসে পৌছতে আবার সুরু হ'ল ডাক্তারী পরীক্ষা, আবার নতুন করে উচ্চতা আর ওজন নেবার পালা। তাছাড়া অফিসারদের ব্যবহারও অত্যন্ত আপত্তিকর ঠেকলো।

পরদিন ভোর পাঁচটায় উঠতে হ'ল। আগের দিন ট্রেন ভ্রমণের ক্লান্তিতে ঘুম ভাঙতে একটু দেরী হয়েছিল। চোখ খুলতেই দেখি একজন লিডিং হ্যাণ্ড ছোট্ট একটা বেত হাতে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে। উঠে দাঁড়াতেই হুকুম হ'ল, "চলো ও-ও-ডি'র কাছে—তোমাদের সবাইকে ডিফলটার ক'রবো।"

ও-ও ডি চোখ রাঙিয়ে বললেন, "প্রথমবার ব'লে কিছু বললাম না। আর যেন কখনও না হয়। মনে রেখো এটা বাড়ী পাওনি।" শারীরিক অবস্থার কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু কে শোনে?

প্যারেডের পর যখন হাতে ঝাড়ু আর বাল্‌তি দিয়ে ডেক্ সাফ করার হুকুম হ'ল তখন আমরা অবাক। শেষ পর্য্যন্ত এই কাজ ক'রতে হবে ?

নালিশ করবার উপায় নেই। পরদিন গেলাম কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছে। বললেন, অবিলম্বে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।

দুদিন কেটে গেল। এর মধ্যে অন্তত ৭ বার ও-ও-ডি'র সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল।

প্যারেডে একটু ভুল ক'রেছি কি অমনি মা-বোন তুলে গালাগালি। অনেক সময় পেছন থেকে লাথিও খেতে হ'য়েছে। কিছু বলার উপায় নেই। মিলিটারী ডিসিপ্লিন !

প্রতিবাদ ক'রলে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা, কাজেই কিল খেয়ে কিল চুরি ক'রতে হ'ত।

'তলোয়ার' জাহাজে ওয়্যারলেস্ অপারেটর হ'য়ে এলাম। এখানে আবহাওয়া একটু ভাল, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া একই। ভাত-রুটিমাংস মুখে দেওয়া যেত না। মাংসগুলো কাঁচা কাঁচা। খাবার টেবিলে রুটি নিয়ে সবাই লোফালুফি ক'রত—খেত না। দেশে যখন লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে ম'রছিল, তখন আমাদের মেঝেয় রাশি রাশি খাবার গড়াগড়ি যেত।

জাহাজের মেসে খেতে না পেরে সবাই ভিড় ক'রত বাইরের ক্যান্টিনে। তবু সেখানে পয়সা দিয়ে ইচ্ছেমত খাওয়া চ'লত।

জাহাজ একবার বন্দরে ভিড়লে বড় বড় অফিসারদের কিছুতেই আর পাত্তা পাওয়া যেত না।

জাহাজে কোন মেয়ে আনা বা রাত্তিরে রাখা বে-আইনী। কিন্তু অফিসারদের বেলায় ওসব নিয়ম খাটতো না। জাহাজেই

তাদের কুটনী থাকতো। বেশী রাত্তিরে মেয়েদের তারা ফেরত দিয়ে আসতো। ছোট কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও নোংরা ভাষায় আলাপ করতে এইসব বড়সাহেবদের বাধতো না।

মদ খেয়ে জাহাজে বেলেল্লাগিরি করা ছিল এদের নিত্যকার কাজ। অনেক সময় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এরা মেয়ে নিয়ে ওয়্যারলেস অফিসে ঢুকে যন্ত্রপাতি বিকল করে দিত। কাজটা বে-আইনী হলেও প্রতিবাদ করার সাহস কারও হ'ত না।

নানা রকমের ফাণ্ড বাবদ অফিসাররা নৌ-সৈন্যদের মাহিনা থেকে কিছু পয়সা কেটে নিত। তাছাড়া অফিসারদের রেশন না দিয়ে একটা নগদ ভাতা দেওয়া হ'ত। সে টাকা নিয়ে যে তারা কি করত কেউ জানে না। কখনও তো তাদের দুধ চিনি আটা ঘি কিনতে দেখিনি।

মাস শেষ হ'য়ে গেলেও অনেক সময় অফিসাররা মাইনা দিত না। একবার এর জন্যে ১০।১২ জন ধর্ম্মঘট ক'রল। শেষ পর্য্যন্ত তারা ভয়ে পিছিয়ে গেল বটে, কিন্তু তিন জন শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকায় তাদের ৯০ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল।

অফিসাররা আমাদের দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর কা অত্যাচারই না করেছে।

সেবার আমরা আকিয়াব আক্রমণ করতে যাচ্ছিলাম। একটা সরু খালের মধ্যে দিয়ে চ'লতে চ'লতে দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে আলো দেখা গেল। কিছুদিন আগে এখানে শত্রুরা ঘাঁটি গেড়েছিল। হঠাৎ আলো লক্ষ্য ক'রে কামান দাগা সুরু হ'ল। সারা রাত্তির ধ'রে গোলাবর্ষণের পর খুব ভোরে দেখা গেল একদল বৃদ্ধ গ্রামবাসী সামনে একটা ফাকা মাঠের ওপর বসে আছে।

তারা ব'ললো, 'জাপানীরা আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করে আমাদের ছেলেমেয়েদের ধ'রে নিয়ে চ'লে গেছে। আমরা জানতাম তোমরা আসবে, তাই একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে উঁচু ক'রে তুলে ধ'রেছিলাম। কিন্তু তোমরা এসে আমাদের ওপর কামান দাগলে। ঘরবাড়ী আমাদের সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।'

আরও অনেক কারণে আমাদের নৌ-সৈন্যদের মন বিষিয়ে উঠেছিল।

স্ট্রাইক করেছে শুনলাম ভারতীয় বিমান বহরের আমাদেরই ভাইরা। সবাই উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। সকলের দৃষ্টি পড়েছে খবরের কাগজের পাতায়—গ্রীস আর ইন্দোনেশিয়া, সোভিয়েট আর আজাদ-হিন্দ ফৌজের দিকে।

ভারতীয়রা কম কিসে? রয়াল নেভি (শ্বেতাঙ্গদের) আর রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি (ভারতীয়দের) শুধু নামেই তফাৎ। আকিয়াব আর রেঙ্গুন চড়াও হবার সময় শ্বেতাঙ্গ বাহিনীকে তো ভারতীয়-দের অধীনেই কাজ ক'রতে হ'য়েছে।

তবু শ্বেতাঙ্গ আর ভারতীয়দের দুটো জাহাজ যখন পাশাপাশি এসে দাঁড়াতো, আমরা লজ্জা পেতাম। ওদের জন্যে রাজভোগের ব্যবস্থা, আর আমাদের জন্যে এমন খাবার যে মুখে দেওয়া যায় না। আরও লজ্জা পেতাম যখন শ্বেতাঙ্গ নাবিকরা অবাক্ হ'য়ে আমাদের ব'লত, 'এ খাবার তোমরা খাও কি ক'রে?' এই সব সাধারণ ইংরেজদের সঙ্গে খুব সহজেই আমাদের ভাব হ'য়ে যেত। প্রায়ই তারা নিজেদের খাবার আমাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে খেত। কেউ ছিল অক্সফোর্ডের ছাত্র, কেউ ছিল অভ্র-মাইনের চাকুরে কিম্বা মজুর। বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে সবাই ছট্‌ফট্ ক'রত। অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত কত সুখ দুঃখের কথা হ'ত।

এদের সঙ্গে শুধু যে আমাদের বন্ধুত্ব জমাট হ'য়ে উঠলো, তাই নয়—সেই সঙ্গে সব বিষয়ে এদের সমান হবার আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠলো।

আমাদের মধ্যে যারা উপরওয়ালাদের দালাল গোছের ছিল, তাদের ওপর সবাই ছিল হাড়ে চটা। প্রায়ই এদের সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বাধতো। ছোটখাটো সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে সকলেরই মধ্যে বেশ সাহস দেখা গেল। আর এই সব দুরন্ত নির্ভীক ছেলেরাই শেষে হয়ে উঠলো 'বিপ্লবী'। দেওয়ালে দেওয়ালে এরা লিখে চ'ললো—'জয় হিন্দ', 'ভারত ছাড়ো', ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটে গেল।

'নেভি ডে' উপলক্ষে ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং এলেন 'তলোয়ার' জাহাজ ভিজিট ক'রতে। তার জন্যে আগের দিন থেকে মহা ধুম প'ড়ে গেছে।

কিন্তু প্ল্যাটফর্মে উঠে তিনি স্যালুট দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় পায়ের দিকে নজর প'ড়লো। লেখা রয়েছে—'ইউনিয়ন জ্যাক্ নিপাত যাক্।' ইউনিয়ন জ্যাক্ ওঠাতে গিয়ে দেখা গেল কারা যেন মাস্তলের দড়িটা আগাগোড়া ছিঁড়ে রেখেছে। বড় সাহেব রেগে আগুন হ'য়ে তখনই সেখান থেকে প্রস্থান ক'রলেন।

এরপর থেকে দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা যেতে লাগলো রাজনৈতিক স্লোগান। ধরা পড়ে সিং ব'লে একটি ছেলের ৯০ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। সিং-এর অপরাধ এই যে, অফিসারদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে উপরওয়ালাদের কাছে সে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। চিঠিতে লিখে ছিল, সরকারী চাকুরী জীবনে আর কখনও সে ক'রবে না।

তারপর এই একই কারণে লিডিং টেলিগ্রাফিস্ট দত্ত আর শ্যাম ধরা পড়লো। এরপর থেকে "তলোয়ারে" আইন কানুন ভীষণ কড়া হয়ে গেল। দিনে ৭৷৮ বার কারণে অকারণে ফল ইন্ করা হ'তো। এ ছাড়া ব্যারাকের মধ্যে মধ্যে, ক্লাসের চারিপাশে গুপ্ত পাহারাও বসানো হলো। এমন কি যারা ডিউটিতে যেত তাদের উপরও সতর্ক পাহারা ছিল। এই সব কারণে একনিবিষ্ট মনে কেউ কাজ করতে পারতো না অথচ ওয়্যারলেস অপারেটরদের একমনে কাজ না করার জন্য মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল তো হতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই অবস্থা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। ফাঁক পেলেই পাহারারত এই সব নাবিকদের সাথে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা তাদের সজাগ করে দেবার চেষ্টা করতাম। শেষে তাদের সাহায্যেই আমরা আবার লিখে চললাম 'ইনাকলাব জিন্দাবাদ', 'জয় হিন্দ' ইত্যাদি। এ কাজ খুবই কঠিন ছিল কেন না এইসব পাহারারত নাবিকরা সব সময় বিশ্বাসযোগ্যও ছিল না। তবু এত বিপদ মাথায় করে আমরা এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলাম এইজন্য যে তাহলে হয়ত প্রমাণাভাবে শ্যাম ও দত্তকে ছেড়ে দেবে। হলও তাই। প্রমাণাভাবে শ্যাম ছাড়া পেল, কিন্তু দত্তের ওপর হাজতবাসের হুকুম হ'ল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ধর্মঘটের আলাপে সবাই মুখর হ'য়ে উঠলো। ১৭ ফেব্রুয়ারী বিকেলে খাবার নিয়ে গণ্ডগোল হ'ল। নালিশ জানাতে গিয়ে ওয়ারেণ্ট অফিসার জবাব দিল, 'ভিখিরি কাঙালদের আবার অত বাছ-বিচার কিসের?' একথা শুনে সেদিন রাত্তিরে কেউ অন্ন স্পর্শ ক'রলো না।

কমাণ্ডার অফিসারের কানে একথা যেতেই তিনি খুব ভারিক্কি চালে বললেন, "তোমরা তোমাদের অভাব অভিযোগের কথা আমাকে জানাও আমি বিবেচনা করে দেখবো।" আমাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, "এই তিন বছর ধরেই তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করে আসছো, আজও তার কোন ফল হয় নাই। অথচ কোন বিপজ্জনক স্থানে লড়বার জন্য আমাদের পাঠাতে তোমাদের ১০ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।" সেদিন সারারাত ধরে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ধর্মঘট করাই স্থির হলো।

গোপনে ওয়্যারলেস খবরটা পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল আর-সি-ও বোম্বাইতে। পরদিন সকালে কেউ প্যারেডে হাজির হ'ল না।

ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘ'টে গেল। বেতারে খবর পাঠাতে দেরী হওয়ায় কম্যাণ্ডার কিং একজনকে 'ভারতীয় বেজন্মা' ব'লে গাল দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর-সি-ও'তে স্ট্রাইক হ'য়ে গেল।

ক'লকাতা, করাচী, দিল্লী, রেঙ্গুন, কলম্বো, লণ্ডন—সমস্ত জায়গায় বেতারে মুহূর্তে খবর চ'লে গেল, আমরা ধর্মঘট করেছি।

রেডিও টেলিফোনে ভারতীয়দের প্রত্যেকটা জাহাজে বিদ্যুতের মত খবর ছড়িয়ে প'ড়ল: নৌ-সৈন্যদের ধর্মঘট স্থরু হ'য়েছে।

খবর শুনে ফ্ল্যাগ-অফিসার-কম্যাণ্ডিং এসে ব'ললেন, 'তোমরা প্রত্যেক জাহাজ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে স্ট্রাইক কমিটি তৈরী কর। তারপর আমার কাছে তোমাদের দাবী জানাও—আমি প্রতিকার ক'রবো।'

অফিসারদের দুর্ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, কম্যাণ্ডার কিং'কে শাস্তি দিতে হবে—প্রথমে এই দাবী নিয়ে, লিডিং টেলিগ্রাফিস্ট এম, এস্, খাঁকে সভাপতি ক'রে স্ট্রাইক-কমিটি তৈরী হ'ল।

বিকেলে পাঁচশো নৌ-সৈনিক আর বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে নিয়ে এক বিরাট মিছিল বার হ'ল। মিছিলের সামনে উড়ছে কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট পতাকা। ট্রাম, বাস, গাড়ী সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল।

এই সমস্ত রাজনৈতিক মিছিল ও হরতাল পরিচালনায় পূর্বে কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশী রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যার জন্য কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনাও সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল। ফ্লোরা ফাউন্টেনে একটি আমেরিকান রেস্টুরেণ্টের মধ্যে একটি আমেরিকান পতাকা টাঙানো ছিল। একদল নৌ-সৈনিক রেষ্টুরেণ্টের ভিতর গিয়ে তার মালিককে প্রথমে পতাকাটি নামিয়ে ফেলতে অনুরোধ করেন কিন্তু অনেক বোঝান সত্বেও কোন ফল হ'লো না। আমেরিকা ও বৃটিশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, এই দুই সাদা চামড়ার দল একই জাতের এই বোধ করি তাদের ধারণা হলো। পতাকাটি টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলবার সময় একজন বলে উঠলো: "সাত-সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আমেরিকা, বৃটিশ বা জার্মান কাউকেই এদেশে রাজত্ব করতে দেওয়া হবে না।" যেখানে যেখানে এই মিছিল বাধা পেয়েছে সেইখানেই পাল্টা আক্রমণের জন্য সবাই তৈরী হয়েছে। পুলিসের লোকেরা প্রথমে এই ধরনের মিছিল ও হরতাল বে-আইনী ঘোষণা করে বাধা দিতে এসেছিলো ফলে মাঝে মাঝে তাদের সাথে বেশ খানিকটা হাতাহাতিও হয়ে গেল। শেষে মার খেয়ে ভাল ছেলের মত তারা রাইফেল নিয়ে মোড়ে মোড়ে দর্শক হিসাবে শোভাবর্ধন করলো। আমাদের সাথে তারা পারবে কেন? একদিকে পুলিস ও মিলিটারী অন্যদিকে বিদ্রোহী

নাবিকরা ও জনসাধারণ। গুলির জবাব যে গুলিতে দিতে হয় এ কথা শেখাতে হয় না।

সমস্ত জাহাজ, সমস্ত নৌ-কর্তৃত্ব তখন স্ট্রাইক কমিটির হাতে। বোম্বাই বন্দরে তখন বিশটা আর-আই-এন জাহাজ। গোটা বন্দর জুড়ে স্ট্রাইক কমিটির অষ্টপ্রহর সতর্ক পাহারা ব'সে গেল।

করাচী বন্দরের 'হিন্দুস্থান', 'চমক', 'হিমালয়' ও 'বাহাদুরে'র নৌ-শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ধর্মঘট হয়ে গেল। মাদ্রাজে 'আধিয়ার' কলিকাতায় 'বেহালা'য়, হুগলী ব্যারাকে, ভিজাগাপট্টমে 'সারকারস্', পুণা, কোচিন এমন কি অন্যান্য সামরিক বিভাগেও সহানুভূতি-সূচক ধর্মঘটের খবর পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষের প্রতিটি বন্দরে ও সামরিক বিভাগে এই ব্যাপক ধর্মঘটের প্রকৃত অর্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুঝতে এতটুকু দেরী হয়নি।

১৯শে ফেব্রুয়ারী জাহাজে জাহাজে জানিয়ে দেওয়া হ'ল—ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে জাহাজের মাস্তুলে জাতীয় পতাকা তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাহাজে জাতীয় পতাকা উড়তে লাগলো। চারিদিকে রব উঠে গেল—স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!!

দু'একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন ইউনিয়ন জ্যাক নামাইতে ভীষণ আপত্তি করে ও বাধাও দেয়। ফলে নৌ-সৈনিকরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজেই ইউনিয়ন জ্যাকের নীচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল এমন সময় বোটে করে একদল ধর্মঘটী নাবিকরা "ইউনিয়ন জ্যাক নিপাত যাক" বলে চীৎকার করতে করতে জাহাজটির গায়ে এসে বোটটি ভেড়ায়। জাহাজের

নাবিকরা এই অবস্থার জন্য ভীষণ লজ্জিত হয়ে উঠলো অথচ ভয়ে কেউই ক্যাপ্টেনের কাছে এগুতে সাহস পাচ্ছে না। সেই সময় হঠাৎ সবাই দেখলো একটি 'ষ্টোকার' বিরাট একটি ছোরা বের করে ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে গেল। অফিসারটি বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার জন্য রিভলবার বের করতে যাবে এমন সময় নাবিকটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার হাত চেপে ধরলো এবং পাশেই ধাক্কা মেরে অফিসারটিকে ফেলে দিলো। এইভাবে কতকগুলি ছোটখাট সংঘটের ভিতর দিয়ে বৃটিশের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো।

প্রত্যেকটা জাহাজে হাতে হাতে আগুনের মত ছড়িয়ে প'ড়ল স্ট্রাইক কমিটির ইস্তাহার: আমরা কি চাই।

অন্যান্য দাওয়ার মধ্যে নৌ-বাহিনী জাতীয়করণ, আজাদহিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার ও বিচার ব্যবস্থা বাতিল, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং ইন্দোনেশিয়া হইতে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের অপসারণ, এই সব দাবী একসাথে করে যখন আমরা এডমিরাল গড্‌ফ্রের কাছে পাঠালাম তা দেখে তিনি তাজ্জব বনে গেলেন। আমাদের দেশে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এ রকম রাজনৈতিক চেতনা আনা সম্ভব তা সাম্রাজ্যবাদী গড্‌ফ্রের ধারণার অতীত। রাগে আমাদের দাবী ছুড়ে ফেলে বললো, তোমাদের অন্যান্য দাবীগুলি ন্যায়সঙ্গত সে বিষয়ে আমি উপরওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারি কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ, "ইন্দোনেশিয়া"—এ সব ত রাজনৈতিক ব্যাপার, এ নিয়ে মাথা ঘামান তোমাদের উচিত নয়। আমরা যখন বললাম, "না, এই-হচ্ছে আমাদের দাবী।" এ দাবী সমস্ত না মেনে নিলে আমরা ধর্ম্মঘট চালু রাখার ব্যবস্থা

করবো। তার উত্তরে খানিকক্ষণ কি ভেবে আস্তে আস্তে সে বললো, "বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাণ্ড।" সে যাই হোক আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য অপসারণ দাবী করেছি বলে কেউ কেউ তখন আমাদের উপর সন্দেহ করছিলেন এই ভেবে যে আমরাও কোন "বিশেষ" রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসাবেই চলেছি।

কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। সে সময় রাজবন্দীদের মুক্তি-আন্দোলন দেশব্যাপী এত বিরাট আকার ধারণ করেছিলো যে সেই আন্দোলনের ঢেউ সাম্রাজ্যবাদের কড়া পাহারা ভেদ করেও আমাদের কানে পৌছিয়েছিল। তা ছাড়া আমাদের মধ্যে যারা যারা আকিয়াব রেঙ্গুন, মাইফু নদী অভিযান এবং সিঙ্গাপুর ইত্যাদি জায়গায় লড়াই করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যেই অনেকে এই আজাদ হিন্দ সৈন্যদের গৌরবময় কাহিনী কতকটা শুনে কতকটা নিজের বাস্তব পরিচয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে গল্প করতো। তারই ভিতর দিয়ে নেতাজীর বাণী তার বিরাট আদর্শের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদকে তাড়াবার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা।

ধর্ম্মঘটীদের ঘেরাও করে ফেলল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী। আন্ধেরী ও মেরিন ড্রাইভ ছাউনীর ধর্ম্মঘটী নাবিকরা বাহির হতে গেলে তাদের উপর লাঠি চার্জ করা হল। এদিকে 'তলোয়ারে'র সামনে মাইক খাটানো হ'ল। ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা হ'তে লাগলো বাইরে কি ঘটছে। ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং খবর পেয়ে বোম্বাইতে ছুটে এলেন। কিন্তু ভারতীয় জাহাজের কাছে ভিড়তে তাঁর সাহস

হ'লো না। শুধু জানিয়ে দিলেন—দরকার হ'লে ভারতীয় নৌ-বহরকে তিনি নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতেও কসুর ক'রবেন না।

তলোয়ারের চারিদেকে মারাঠা রেজিমেণ্টের পাহারা বসান হ'ল। প্রচার করা হ'ল, বেলা তিনটের পর নৌ-সৈন্যদের যাকেই রাস্তায় পাওয়া যাবে, তাকেই গ্রেপ্তার করা হবে।

এদিকে ধর্ম্মঘটী 'নর্মদা' থেকে সমস্ত জাহাজে জানিয়ে দেওয়া হল, যে-সব অফিসাররা আমাদের ষ্ট্রাইকে যোগ না দিতে চাও, তারা, বেরিয়ে যাও।' সমস্ত জাহাজ থেকে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় অফিসাররা বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গেল।

তিনটের পর সেদিন যারা বাইরে ছিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে ক্যাস্‌ল্‌-ব্যারাকে নিয়ে গেল। সমস্ত জাহাজে আর সমস্ত নৌ-শিবেরে রেশন বন্ধ হয়ে গেল। ক্যাস্‌ল্‌-এ জল পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। করাচীতে 'হিমালয়' ও 'চমক' জাহাজের নৌ-সেনারা 'হিন্দুস্থান জাহাজে'র দিকে অগ্রসর হতে থাকলে বৃটিশ পেট্রল লঞ্চ হইতে তাদের উপর গুলি চালান হল।

করাচী বন্দরে জাহাজের গায়ে দেশী ছাপের লেখা "বিদ্রোহ নহে ভারতীয় নাবিকদের ঐক্য"। ব্যারাকের সমস্ত ধর্মঘটী নৌ-সেনারা "হিন্দুস্থানে"র দিকে যাবার সময় গুলি খেল—গুলির জবাব আসল গুলিতে। ১৪।১৫ বছরের নৌ-সেনারা 'হিন্দুস্থান' জাহাজ থেকে বৃটিশ ক্যাম্পের উপর কামান দাগল। আধ ঘণ্টা সমানে কামান চালিয়ে কিমারী ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে।

২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে হুকুম হ'ল সমস্ত আটক নৌ-সৈন্যদের নিজের নিজের জাহাজে ফিরে যেতে হবে। সবাই একসঙ্গে আওয়াজ

তুল্লো :—তলোয়ারের নৌ-সৈন্যরা যেখানে আছে সেখানে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে যেতে দিতে হবে।

মারাঠা রেজিমেণ্টের অফিসার ভয় দেখাবার জন্যে বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করল। তারপর খানিকক্ষণ স্তব্ধতা।

হঠাৎ নৌ-সৈন্যদের একজন চিৎকার করে উঠলো—"মারাঠা ভাইসব, তেমরা কেন আমাদের ওপর গুলি চালাবে? তোমরা স'রে যাও।"

মারাঠা সৈন্যরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বন্দুক ফেলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে মারাঠাদের সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বৃটিশ সৈন্যবাহিনী। আধঘণ্টার মধ্যে ছবির মত সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল।

এই আধঘণ্টার ভিতর ক্যাস্‌ল-ব্যারাকের নৌ-সৈন্যরা তৈরী হয়ে নিয়েছে। গেটের সামনে পাঁচটা লরী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'লো, যাতে কেউ সহজে বাইরে থেকে না আসতে পারে। সমস্ত গোলাবারুদের বাক্স ভাঙা হ'য়ে গেল। যুদ্ধসাজ প'রে সবাই তৈরী।

ব্যাপার দেখে গোরা সৈন্যরা ভিতরে ঢোকার জন্যে এগিয়ে গেল। কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় ভিতর থেকে আওয়াজ এলো :—হল্ট্। সবাই দাঁড়িয়ে প'ড়ল।

হঠাৎ পিছন থেকে বৃটিশ সৈন্যের হাতে রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল—গুম্—গুম্ গুম্। পরক্ষণে টমি গান, তারপর মেশিন গান গর্জ্জে উঠলো। ব্যারাকের ভিতরে তখন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর মধ্যে সাজ সাজ রব প'ড়ে গেল। বন্দুকের জবাব বন্দুকের মুখে দিতে হবে।

রাইফেল আর মেশিন গান, রিভলভার আর হাত-বোমা—যে যা সামনে পেলো তাই নিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে গেল। পিছনে বন্দরের জাহাজগুলোকেও সে খবর জানিয়ে দেওয়া হল।

ঘণ্টা দুই ধ'রে দুপক্ষের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের পর ফ্ল্যাগ অফিসার খবর পাঠালো; 'যুদ্ধ বন্ধ করো। আমরা শান্তির পতাকা তুল্‌ছি।'

পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেল—কোথাও কোন শ্বেত-পতাকার চিহ্ন দেখা গেল না। বরং খবর পাওয়া গেল, ক্যাস্‌ল্‌-ব্যারাক দখল করায় জন্যে আরও বৃটিশ সৈন্য আসছে।

ব্যারাকের ভেতরে থেকে নৌ-বাহিনীর ৪ জন ক্যাপ্টেন গোপনে ফ্ল্যাগ অফিসারের কাছে খবর পাঠাতে গিয়ে নৌ-সেনাদের হাতে ধরা পড়ে গেল। মারের চোটে শেষ পর্য্যন্ত তাদের একজনকে হাসপাতালে যেতে হ'ল।

জাহাজে জাহাজে খবর চ'লে গেল: তৈরী থাকো—যে কোন মুহূর্ত্তে লড়াই সুরু করতে হবে। প্রত্যেক জাহাজে কি পরিমাণ গোলা বারুদ আর কতদিনের রসদ আছে, তার হিসেব নেওয়া হ'ল। যাদের কম ছিল, তাদের সাহায্য করা হ'ল।

আবার সমানে আট ঘণ্টা ধ'রে দু'পক্ষের তুমুল লড়াই চললো। বিপক্ষের ২৪ জন বৃটিশ সৈন্য নিহত হল, আর আমাদের মাত্র ৩ জন।

নয়া দিল্লীর হেডকোয়ার্টার হ'তে সন্ত্রস্ত অভিযানের আওয়াজ শোনা গেল। খবর আসল লণ্ডন থেকে আমাদের দমন করবার জন্য শক্তিশালী নৌ ও বিমান বাহিনী পাঠানো হচ্ছে। এটলীর এই চ্যালেঞ্জকে সাদরে গ্রহণ করে রুখে দাড়াল করাচীর "হিন্দুস্থান"

জাহাজে চরম পত্র পাওয়া গেল দিল্লীর সামরিক বিভাগ থেকে "সন্ধ্যার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে সমস্ত নৌ-বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলা হবে।"

এর পর বোম্বায়ের জনগণ উদগ্রীব হ'য়ে উঠল, "আমরা কি করি, কোন পথে যাই "জানতে।" উত্তেজনায় টাউন হ'লের পিছনে হাজার হাজার মানুষ জড় হল।

গেট অফ্ ইণ্ডিয়ায় দলে দলে নর-নারী, শিশু যুবক বৃদ্ধ, হিন্দু মুসলমান সারা ভারতের সকল প্রদেশের লোক আসিয়া জুটল। বোটে করে জল খাবার, সিগরেট আর কত কি তারা জাহাজে জাহাজে ছুড়ে দিয়েছে। এমন কি ক্যাসেল ব্যারাকের উপর গুলি চলবার সময় সাধারণ লোকেরা পাঁচিলের উপর উঠে ভিতরে খাবার দিতে গিয়ে ১৮ বছরের একটি মজুর গুলিতে আহত হয়। ইহাকে আঘাত করতে বৃটিশের হাত এতটুকু কাঁপে নাই।

পুলিশের ছাউনীর পেছনে সাগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে জনতা প্রত্যেকের মুখ বেঁকে গেছে, ক্রোধে চিবুকের পেশী কেঁপে উঠেছে—

দেশবাসী আমাদের মরতে দেবে না।

চারিদিকে ব্রেনগান, রাইফেল ও হাতবোমার শব্দ। এই যুদ্ধে কে জিতবে, কে হারবে কিছুই বোঝা যায় না। খবর এল আধ ঘণ্টা বোমা চালাতে চালাতে 'হিন্দুস্থান' জাহাজে আগুন লেগে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এল এডমিয়াল গডফ্রের হুমকি।

সাধারণ মানুষ এগিয়ে এল আমাদের পাশে। এক সাথে প্রতিজ্ঞা করল: "বিদ্রোহী নাবিকদের মরিতে দেব না।"

এ ডাক স্বদেশ প্রেমের ডাক—লাল রক্তের ইজ্জতের ডাক।

পরের দিন সকাল থেকেই সারা সহরের ট্রাম, বাস সব বন্ধ হয়ে গেল। হাজার হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে বের হয়ে এল রাস্তায়। স্কুল কলেজের ছাত্ররাও এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। মুসলিম ও হিন্দু এলাকায় বিক্ষোভ ফেটে পড়ল।

কলিকাতা, করাচী ও মাদ্রাজের লক্ষ লক্ষ সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও ছাত্র ধর্মঘট করে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক পেতে দিল। সারা ভারতবর্ষ বৃটিশের বিরুদ্ধে "শেষ আঘাত হানবার" জন্য রুখে দাড়াল।

লীগ ও কংগ্রেসের দুর্ব্বলতায় সুবিধা হল বৃটিশের। চারিদিকে জনতায় মিছিলের উপর অবাধে গুলি চলল। আমাদের উপরের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল নিরস্ত্র নর-নারীর, শিশু বৃদ্ধের উপর। ২৪ শে তারিখে এমন একটি রাস্তা নেই বোম্বাইতে যেখানে দোকানের জানলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বুলেটের দাগ গাথিয়া যায় নি দেওয়ালে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে অবলাপ করতে করতে দলে দলে হেটে চলেছে নর-নারীর দল। একটি অদ্ভুত দৃষ্টি তাদের চোখে ফুটে উঠেছে। আর এই ভাঙ্গা গলায় শ্লোগান উঠছে—হিন্দু-মুসলিম এক সাথ! ব্যারিকেডের পাশে অথবা কবরখানায়। ভুতুড়ে সহর বোম্বে। প্রায় ৩০০ জন নিহত আর দুই হাজারের উপর আহত।

দেখেছি বর্ব্বর জাপানের পাশবিক অত্যাচার কোহিমার জঙ্গলে, আকিয়াব ও রেঙ্গুনের অসহায় ছেলে বুড়ো ও মেয়ের উপর। সেদিন আবার তার পুনরাবৃত্তি দেখলাম বোম্বাই শহরের রাস্তায় রাস্তায়।

পরের দিন ভোরে নর্ম্মদায় ২০টা জাহাজের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে একটি বৈঠক বসল। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিল ইষ্ট ইণ্ডিজ ফ্লিটের একজন কমাণ্ডার। এই ফ্লিটকে বিশেষ সঙ্কেত দ্বারা বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য পাঠান হয়েছিল। সারা বোম্বাই আমাদের হস্তগত ছিল বলিয়াই আর আমাদের সতর্ক পাহারা ভেদ করে এই "ফ্লিট" বোম্বাই বন্দরে ঢুকতে সাহস করে নি। রাতের অন্ধকারে এসে তারা আত্মগোপন করেছিল।...বন্দরের একটি ছোট ভারতীয় জাহাজ থেকে সেই রাতেই চ্যালেঞ্জ করা হয়, উত্তর তারা "বন্ধু" তাহাই জানাল।

তবু সতর্ক থাকাই ভাল এই মনে করে গোপনে বন্দরস্থিত সমস্ত জাহাজকে জানিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে "সাজ" "সাজ" রব পড়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সমস্ত জাহাজের কামানের মুখ ফিরিয়ে আনা হল, বৃটিশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ইষ্ট ইণ্ডিজ ফ্লিটকে ধ্বংস করার জন্য। কারও চোখের পাতা পড়ছে না, প্রতিটি মিনিট এক একটি ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে আর গভীর উদ্বেগে নাবিকরা অপেক্ষা করছে কখন অর্ডার আসবে কামান দাগবার জন্য। খানিক পরে খবর এল "সোর ব্যাটারী" প্রস্তুত। রাত কেটে গেল কোনরূপ অর্ডার পাওয়া গেল না। যুদ্ধের আয়োজন শুধু হল যুদ্ধ হল না।

এই বৈঠকে ফ্লিটের কমাণ্ডার জানাল বৃটিশের সাথে লড়াই করবার উদ্দেশেই আমরা 'বিদ্রোহ' করেছি সেইজন্য এই বিশেষ ফ্লিটকে পাঠান হয়েছে। আমরা জানালাম আমাদের মতামত, যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নাই আমাদের, দাবীর জন্য বাধ্য হয়ে আমরা ধর্ম্মঘট করেছি। তখন সেই অফিসারটি ফিরে গেল এই বলে যে, "আমাদের দাবী ন্যায়

সঙ্গত একথা উপরওয়ালাকে সে জানাবে।" আমরা ফিরে এলাম। জাহাজ থেকে নামবার সময় ভারতীয় নাবিকরা আমাদের প্রতি নায্য সম্মান দেখাতে ভোলে নি। তখন আমরাই ত ভারতীয় নৌ বাহিনীর কর্ণধার।

বেলা তিনটায় ফ্লাগ অফিসার ষ্ট্রাইক কমিটির নেতাদের সঙ্গে দেখা করে লড়াই থামাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। তিনি নৌ-সৈন্যদের দাবী মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ষ্ট্রাইক কমিটির একজন প্রতিনিধিকে ক্যাসল-ব্যারাকে পাঠিয়ে দিয়ে বেলা ৪টার সময় লড়াই বন্ধ করা হ'ল।

এদিকে লড়াই আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্রাইক কমিটির প্রতিনিধিরা সর্দার প্যাটেল ও অরুণা আসফ আলির সঙ্গে দেখা করলেন। সর্দ্দার প্যাটেল ভর্ৎসনার সুরে ব'ললেন, 'হিংসাত্মক পথে পা বাড়ানো তোমাদের উচিত হয় নি—তোমাদের অহিংসার পিছনে পুরাপুরি হিংসাই রয়েছে। এখুনি গিয়ে সংগ্রাম বন্ধ করো।'

সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে অনেক তর্কাতর্কি হ'ল। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমরা একটুকু ছেলে—রাজনীতির কি বোঝ? যাও এখান থেকে। এখুনি লড়াই বন্ধ করো।'

বোম্বাইয়ের লীগ অফিসের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করা হল। তিনি বললেন, 'মিঃ জিন্নাকে তার করেছি আসবার জন্যে। তিনি এলেই সব জানতে পারবেন।'

এদিকে বোম্বাইয়ের পথে পথে তুমুল কাণ্ড চলেছে। জনসাধারণ এগিয়ে এসেছে নৌ-বাহিনীর ভাইদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে। হাতে তাদের কংগ্রেস, লীগ আর লাল ঝাণ্ডা। বৃটিশের বুলেটের মুখে রাস্তার হাজার হাজার মানুষ বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। পথে

পথে তৈরী হ'য়েছে অবরোধ। স্তূপাকার হ'য়ে উঠেছে ইট আর পাথর —নিরস্ত্র জনসাধারণের হাতিয়ার।

রাত্রি ১১ টার সময় দিল্লী সদর ঘাঁটি থেকে ষ্ট্রাইক কমিটির কাছে খবর এলো—'আধ ঘণ্টার মধ্যে জানাও তোমরা বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ ক'রবে কি ক'রবে না।'

সর্দ্দার প্যাটেলের পরামর্শ চাওয়া হ'ল। তিনি ব'ললেন, 'তোমরা আত্মসমর্পণ করো। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তোমাদের দাবী নিয়ে আমরা লড়বো। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোন রকম শাস্তি পেতে হবে না।'

রাত্রি ১২টায় সর্দ্দার পেটেলের নির্দ্দেশ মত 'তলোয়ার' আত্মসমর্পণ ক'রলো।

ভোরে উঠে সবাই দেখলো 'তলোয়ারে'র মাস্তুলে একটা বড় কালো নিশান উড়ছে। 'তলোয়ারে'র দেখাদেখি ষ্ট্রাইক কমিটির নির্দ্দেশ মত বাকি সমস্ত জাহাজ পরদিন সকালের মধ্যে আত্মসমর্পণ ক'রল।

*　　*　　*　　*

আত্মসমর্পণের কালো পতাকা তোলবার সময় চোখের জল মুছতে মুছতে তারা বললো, "নেতাদের নির্দ্দেশে আমরা আমাদের সমস্ত গোলাগুলি বৃটিশের হাতে তুলে দিব, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের দাবী পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ প্রর্য্যন্ত আমরা শান্তি পূর্ণ হরতাল করে যাব।" হ'লও তাই। বন্দরস্থিত কুড়িটা জাহাজের মধ্যে ৫।৬টি জাহাজের নাবিকরা তখনও ধর্মঘট করে চলে ছিলো।

এই ৪।৬টি জাহাজের ষ্ট্রাইককমিটির প্রেসিডেন্টরা একত্রে বসে ঠিক করল যে কেন্দ্রীয় ষ্ট্রাইক কমিটির কাছ থেকে লিখিত কোন নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ধর্মঘট চালু থাকবে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপটেনরা ফিরে এসেছে। প্রাণ ভিক্ষা করে এই সব শেতাঙ্গ অফিসাররা ভারতীয় জাহাজ ছেড়ে নেমে গেছিল, আজ তাদের আবার ফিরে আসতে দেখে নাবিকরা ফুলে উঠল। কোন অফিসার জাহাজে উঠবার সময় তাদের সম্মানের জন্য "স্যালুট" করাই নিয়ম। এই ধরণের রাজকীয় অভ্যর্থনা করতে সেদিন কোন নাবিকই এগিয়ে এলো না। চারদিন অকান্ত পরিশ্রম করে আমরা নিশ্চিন্ত মনে মেস ডেকে ঘোমাচ্ছিলাম। হঠাৎ "জরুরী ঘণ্টা" বেজে উঠল। এই সঙ্কেত অন্য সময়ে আমাদের কাছে চরম বিপদের ডাক। আজ এর জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি। সবাই মুচ্‌কে হেসে পাশ ফিরে শুল। রাগে গর গর করতে ক্যাপটেন উপর থেকে নেমে এলো। আমাদের দেখে জেনেও কিছু জানে না এই রকম ভাব দেখিয়ে বললো, "তোমরা বিপদের সঙ্কেত শুনতে পাও নি! আর আধ ঘণ্টা তোমাদের ভাববার সময় দিচ্ছি এর মধ্যে কাজে যোগদান না করলে তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে "চার্জ্জ" আনা হবে।" বৃটিশের যে কোন চার্জ্জের বিরুদ্ধে দাড়াতে আমরা প্রস্তুত। কসম খেয়েছি কেউ কাজ করব না।

এ খবর চলে গেল এফ্‌, ও সির কাছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে এফ্‌, ও, সির প্রাইভেট সেক্রেটারী জাহাজে এসে হাজির। ডাক পড়ল ষ্ট্রাইক কমিটির প্রেসিডেণ্টকে। ধর্মঘট তুলে নিতে অনুরোধ করেও অফিসারটি নিরাশ হল। কেন্দ্রীয় ষ্ট্রাইক কমিটির বিশ্বাসযোগ্য কোনরূপ নিদর্শন পত্র দেখান তার পক্ষে সম্ভব হল না। শেষে

এই সব ধর্মঘটী বিভিন্ন জাহাজের প্রেসিডেন্টরা একত্র হয়ে ফ্ল্যাগ সিপ্ "নর্ম্মদায়" গিয়ে উঠল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ষ্ট্রাইক কমিটির কোন নির্দ্দেশ এলো না। আমরা ফিরে এলাম। আসবার সময় বিভিন্ন জাহাজের নাবিকরা আমাদের এই সংগ্রামকে অভিনন্দিত করে আরও উৎসাহিত করে তুলল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাহাজের ভূতপূর্ব্ব ষ্ট্রাইক কমিটির প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে গোপনে চিঠি এলো এই সংগ্রাম সমর্থন করে। বেতারে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলাম, "আমরা এখনও ধর্মঘট করে চলেছি। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই ধর্মঘট আমরা চালু রাখব।" সারাদিন ধরে বোম্বাইয়ের শত শত নরনারী সমুদ্রের ধারে 'ভারতীয় জাহাজের" "দর্শন নিতে এলো।

এদিকে বোম্বাই সহরে কারফিউ, ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকলেও সহরের স্থানে স্থানে সভা, শোভাযাত্রা বের হয়। শ্রমিকদের মিলিটারী যদৃচ্ছ গুলীবর্ষণ করে।

রাতে বিভিন্ন জাহাজের কমাণ্ডিং অফিসার নাবিকদের আশ্বাস দিলেন যে তাদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে শীঘ্রই বিবেচনা করা হবে। ধর্মঘটের ক'দিন কারও মাইনা কাটা এবং কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হবে না। অফিসারদের কাছ থেকে সরাসরি এইভাবে আশ্বাস পাবার পর এই সব জাহাজের ধর্মঘটী কমিটির সভাপতিরা একসাথে মিলে সব ধর্মঘট তুলে নেওয়াই স্থির করলেন।

পরদিন ভোরে শেতাঙ্গ সৈনিকরা আমাদের জাহাজ দখল করলো। গোলা, বারুদ, কামান এমন কি আমাদের বিছানাপত্র খানাতল্লাস করে ছোট পেনসিল কাটা ছুড়ি পর্য্যন্ত হস্তগত করে। জাহাজে কারফিউ চালু হয়ে গেল এবং আপার ডেকে মিলিটারী ছাড়া

যে কেউ উপরে উঠবে তাকেই গুলি করা হবে। এই সব ছোট্ট জাহাজে চলাফেরা করা একেই ভীষণ অসুবিধা তারপর এই রকম 'কারফিউ' থাকলে ত কথাই নাই। তখনও প্রর্য্যন্ত নতুন রেশন আসেনি। খাবার জলের টেঙ্ক খালি হয়ে গেছে। ক্যাপটেনকে বার বার জানিয়েও কিছুই ফল হল না। তাদের জন্য বোটে করে বোতল বোতল লেমনেড, বিয়ার, আর মদ আসতে দেরী হয় নি। শেতাঙ্গ সৈনিকের জন্য এসেছে ডিম, রুটি, জাম আর মাখন আর চারদিন আধ পেটে থাকার পরও আমাদের ভাগ্যে এক ফোটা জল, কাকড় ভরা গুদাম পচা চাল, ভুসির ডাল এনে পৌছাতে সময় নেবে বৈ কি? তাদের ছ'মাসের খাবার তৈরী আগে থেকেই থাকে। এই সব খাবার জোগাতে অনেক গ্রাম অনেক সহর অনেক মানুষকে অনিচ্ছাকৃত দুর্ভিক্ষের মধ্যে টেনে ফেলে দিতে হয় আর আমাদের দাবীর বেলায় "দুর্ভিক্ষের" ও পৃথিবীব্যাপি অর্থনৈতিক সঙ্কটের দোহাই দেওয়া হয়। আর দুঃখের কথা জাতীয় নেতারা সাম্রাজ্যবাদীর এই চাল নীরবে বরদাস্ত করে চলেন।

পরের দিন ভোর সকাল সকাল সবাইকেই ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হল, কোন একটি অফিসারের একশত টাকা চুরির দোহাই দিয়ে আমাদের বিছানা, কিট্‌ব্যাগ সব তল্লাস করা হয়। যারা বিদ্রোহের নিশান তুলল, যা ছিল বৃটিশের মৃত্যুপরোয়ানা তাদের পরের দিন চুরির অজুহাতে খানাতল্লাসী করা এ অপমান আমাদের ভীষণ আঘাত করল। খানাতল্লাস শেষে হলে আমাদের বেছে বেছে দশ জনকে আবার গ্রেপ্তার করা হল। পাশেই জাহাজের গায়ে ভিড়লো সশস্ত্র মিলিটারী বেষ্টিত একটি বোট। [illegible] কারও

বাকী রইল না আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা হাসতে হাসতে বোটে উঠলাম। এই ধরণের একটা কিছু আমাদের হবে তা আমরা জানতাম। অন্যান্য নাবিকরা একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের জল মুছতে মুছতে ওরা আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাল। কমাণ্ডিং অফিসার নিচে নেমে এলো। আমাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গেল তার দিকে। কোনরূপ সঙ্কোচ না করে বজ্র কঠিন গলায় সে বলল, "তোমার বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় অনেক পেয়েছি, এইবার আমাদের প্রতিশোধ নেবার পালা।" ক্যাপটেন অবশ্যি বিজ্ঞের মত মুচ্‌কে হেসে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। তিন বছরের সুখ দুঃখের সাথী জাহাজের নাবিকরা হাত নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে বললো, "আবার তোমরা ফিরে আসবে।" বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্।

* * * *

বোটে করে এসে নামলাম বোম্বাই বন্দরে। পাশেই পথের উপর দাড়িয়ে রয়েছে সারি সারি মিলিটারী গাড়ী। আমাদের আগে আরও অন্যান্য জাহাজ থেকে এই রকম বেছে বেছে ধর্ম্মঘটী নেতাদের গ্রেপ্তার করে এখানে হাজির করা হয়েছে। পূরাণ বন্ধুদের পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। সহরের পাশে আকা বাঁকা পথ দিয়ে গাড়ী এগিয়ে চলেছে এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে। রাস্তায় তখন ২।১টি পথচারী ছাড়া কেউই নজরে পড়েনি। যাকেই দেখেছি হাত নেড়ে, চিৎকার করে দেখাতে চেয়েছি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছিল আমাদের

দেখে থমকিয়ে দাড়িয়ে পড়ল। অনেকদিনের পরিচিত বলে মনে হল। ছোট ছোট হাত নেড়ে "জয়হিন্দ", "নেভীবালো জিন্দাবাদ"··· এই বলে আমার অভিনন্দিত করল। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি তবু যাবার আগে এই সব কচি মনে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে জেনে আশার সঞ্চার হল। ভারতীয় নাবিকদের বিদ্রোহের অসম্পূর্ণ অংশটি এরা শেষ করবে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাবিকটির "প্রতিশোধের" কথা মনে পড়ল। এইভাবে চলতে চলতে গাড়ীর আড়ী পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এসে থামলো একটি ধ্বংসস্তূপ ক্যাম্পের কাছে। পরে জানতে পারলাম এই "মুলান্দ ক্যাম্প"।

বিদ্রোহী নাবিকদের স্পর্শে এই ক্যাম্প অমর হয়ে রইল।

······আমাদের জাতীয় জীবনে ঐ ধর্মঘট এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও ভারতের জনসাধারণের রক্ত একই ধারায় প্রবাহিত হইল। এই অভিজ্ঞতা সৈন্যবাহিনীর কেহ কখনও ভুলিতে পারিবে না এবং 'আমরা জানি আপনারা আমাদের ভাইবোনেরাও ইহা কখনো ভুলিতে পারেন না।' ভারতের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হউক।—জয় হিন্দ।

[নৌ-বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্মঘট স্থগিত রাখা সম্পর্কে শেষ বিবৃতি হইতে]

মুলুন্দ ক্যাম্প

এখানে নেমেই প্রথমে যা নজড়ে পড়ল তা হচ্ছে অফিসারদের ব্যস্ততা ও মারাঠা সৈন্যদের সামরিক কায়দায় পাহাড়া দেওয়া। রাইফেল, মেশিনগান, বোমা আরও কত কি নিয়ে চারিদিকে শুয়ে, বসে দাড়িয়ে এই সব নানা কায়দায় পাহাড়া দেবার ভঙ্গী দেখে আমাদের ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। এদিকে অফিসারদের কারও হাতে, পায়ে, মাথায়, বিপজ্জনক চিহ্ন লাল কাপড় তাও একটা দেখার বিষয় হয়ে উঠল। এই ভাবে হাসতে দেখে ওরা ভীষণ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। একটু পরেই কমাণ্ডিং অফিসার এসে ভারিক্কি চালে বাছা বাছা কতকগুলি উপদেশ দিয়ে জানিয়ে দিল, "এখানে তোমাদের শাস্তি দেবার জন্য নিয়ে আসা হয় নি, তোমরা একটু "অশান্ত" তাই নতুন করে নৌ-বাহিণীর নিয়মানুবর্ত্তিতা তোমাদের শিখতে হবে।"

ঝানু সাম্রাজ্যবাদের এই কথার জবাব দিল ক্যাসেল ব্যারাকের একজন নাবিক, "দশ বছর ধরে তোমাদের কাছ থেকে এই "নিয়মানুবর্ত্তিতা" শিখে এলাম, তাই আজকে নতুন করে শিখবার কিছু নেই। এবার তোমাদের শেখাবার সময় এসেছে।" ক্যাপটেন নট্, কমাণ্ডারকিং, এডমিরাল গডফ্রের মত সাম্রাজ্যবাদীরা দু'শ বছর পর এই প্রথম ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে যে শিক্ষা পেল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসে পড়ার আগে পর্য্যন্ত তাদের মনে থাকবে।

সারাদিন আধপেটা খেয়ে,আর সব ক'টা দিনের পরিশ্রমে সবাই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই সেদিনকার মত ভাঙ্গা, ছেঁড়া

খাটে কোন রকমে দলা পাকিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কারও কারও ভাগ্যে আবার খাট ও জুটল না, তাই শুতে হল মাটির উপরেই। ভোরে যথারীতি রুটিন মাফিক কাজ সুরু হ'ল। কোয়াটার মাষ্টার এসে ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে "পাইপ" বাজিয়ে গেল। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হলো না কেউ উঠবে। কোয়াটার মাষ্টারকে জানান হল "এখানে ওসব রুটিন মাফিক কাজ চলবে না। আমাদের ঘুমাতে দাও। এটা বন্দী শিবির নয় এটা আমাদের ঘর।" এই রকম ছোট খাট নানা মজার ঘটনা ঘটত। একবার রাত ৯টায় কমাণ্ডিং অফিসার "রাউণ্ড" দিতে বেরুল। এই সময় সবার উঠে দাড়াতে হয়, একটি নাবিক এই রাউণ্ডের সময় কমাণ্ডিং অফিসারকে দেখেও দেখেনি এই রকম ভান করে বসে বসে আপন মনে বইপড়ছিল। অফিসারটি এসে তার সামনে মিনিট দুই চুপ করে দাড়িয়ে রইল। সে হয়ত ভেবেছিল এর পরও ভীষণ লজ্জা পেয়ে উঠে দাড়াবে কিন্তু সেই "নাবিকটির" উঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রেগে অফিসারটি বলল, "জান, আমি কে? খুব স্পষ্ট ভাবে সে জবাব দিল "জানি—কিন্তু আমাকে বিরক্ত কর না আমি বই পড়ছি। আমি এখন দাড়াতে পারব না।" এই ধরণের জবাবের জন্য কমাণ্ডিং অফিসারটি প্রস্তুত ছিল না। চলে যাবার সময় ভীষণ শাসিয়ে গেল নাবিকটিকে। শেষে একটি ভারতীয় অফিসারের মধ্যস্ততায় এই ব্যাপারটির মিমাংসা সেদিন হয়ে গেল। এই রকম ব্যাপার প্রতিদিনই হত। শেষে এই রকম ভাবে অফিসারদের নাজেহাল করা আমাদের একটা অভ্যাসের মধ্যে দাড়িয়ে গেল। ফলে হ'ত কোন অফিসারই তিন চার দিনের বেশী ওই ক্যাম্পে টিক্তে পারত না।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন একটি ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা বিরাট চাঞ্চল্য এলো। ভোরে ঘুম থেকে উঠে একদিন সবাই দেখল ব্যারাকে ব্যারাকে কে যেন কি ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র "কৌমি জঙ্গ" ও Peoles age ছড়িয়ে দিয়েছে। আগ্রহের সঙ্গে সবাই তা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে সুরু করে দিল। এতদিন পর কাগজ পরবার সুযোগ পাওয়াতে বাহিরের জগত সম্বন্ধে জানবার বিরাট আগ্রহ দেখা গেল বন্দী নৌ-সেনাদের মধ্যে। উর্দ্দু কবি জোশ মহলানাবিশের লেখা একটি কবিতাই সবচেয়ে বেশী উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। পরে সবার মুখে মুখে এই কবিতা ছড়িয়ে পড়ল: এই রকম ভাবে শেষে আরও কাগজ পুস্তিকা আমাদের মধ্যে এসে হাজির হল। এ যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর সবার গভীর শ্রদ্ধার ভাব দেখা গেল। মুক্তির আস্বাদে আমরা উল্লসিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু এটা দানা বাধবার আগেই ঝানু সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মধ্যে বিশেষ গুপ্তচরদের ছড়িয়ে দিল। তারা এসে নাবিকদের দুর্ব্বলতাকে আঘাত করে, সাম্প্রদায়িকের বিষ ছড়াতে সুরু করে দিল। অনেক কষ্টে এই গুপ্তচরদের মধ্যে একজনকে নাবিকরা আবিষ্কার করে ফেলল এক অন্ধকার রাতে যখন সে গোপনে একটি গুপ্ত বৈঠকে আড়ি পাতছিল। এইভাবে গুপ্তচরদের স্বরূপ সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল—এর পরই এলো রেডিও। সেই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কে কটা চেয়ার পাবে তাই নিয়ে তুমুল ঝগড়া চলছিল। আর তারই প্রতিক্রিয়া হল আমাদের মধ্যে। মুসলমান যারা তারা লীগকে সমর্থন করল, যারা হিন্দু তারা করল কংগ্রেসকে। এইভাবে দুইভাগে মুলুন্দ ক্যাম্পের বিদ্রোহী নৌ সেনারা

ভাগ হয়ে গেল। অবশ্য সবার ভিতরেই যে এর প্রতিক্রিয়া এল তা নয়। কেন্দ্রীয় ষ্ট্রাইক কমিটির যারা যারা সেই ক্যাম্পে তখন ছিলেন তারা সেনাদের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করে, হিন্দুমুসলমানের মিলনের ভিত্তিতেই যে সত্যিকারের দাবী আদায় হবে এ কথা ব্যারাকে ব্যারাকে গিয়ে প্রচার করতে থাকেন। আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের ভুল। আবার একসাথে কাজ করবার স্পৃহা জেগে উঠল।

এদিকে একদল নৌ-সেনারা পালাবার ফন্দি বের করতে উঠে পরে লেগে গেল। সকাল সন্ধ্যায় যখনই সময় হত শিবিরের চারি পাশের মারাঠা সৈন্যদের উত্তেজিত করার চেষ্টা হল। বিভিন্ন গান, বক্তৃতা, হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে নৌ-বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা বৃটিশের ষড়যন্ত্র এই সব প্রকাশ করে মারাঠা সৈন্যদের রীতিমত বিদ্রোহের পথে টেনে আনবার চেষ্টা চলল। কিন্তু ষ্ট্রাইক কমিটির কোনরূপ সমর্থন না পাওয়ায় তখনকার মত সেই সব নৌ-সেনারা খান্ত হন।

এরই ভিতর একদিন খাবার নিয়ে গণ্ডোগোল হয়ে গেল। এইচ ব্লকের লীডিং টেলিগ্রাফিষ্ট রবার্ট খাবার আনবার সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বলে, "এত কম খাদ্য আমি বিলি করতে পারব না। হয় খাদ্য বাড়িয়ে দিন, নতুবা আপনি নিজে এসে বিলি করুন। অফিসারটি তাকে 'ষ্টুপিড' বলে ধমক দিলে রবার্টের সঙ্গে তার বচসা হয়। শেষে অফিসারটি তার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। মূহূর্ত্তের মধ্যে এই খবর রটে গেল সারা মুলুণ্ড ক্যাম্পে। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ সরূপ "ভূখ হরতাল" হয়ে গেল। পরের দিনও যথারীতি খবোর এলো কিন্তু কেউউ তা স্পর্শ করে নি।

৪০০ লোকের খাবার ড্রেনের মধ্যে পচতে লাগল তবু অফিসারের এই দুর্ব্যবহারে মীমাংসা হল না।

এরপর হঠাৎ একদিন 'সিনেমা' দেখাবার ব্যবস্থা করা হল। অনশন ধর্ম্মঘটি নৌ সেনাদের নৈতিক চরিত্রের অ ঃপতন করা যায় কিনা কর্ত্তৃপক্ষ তাহাই যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করল।" "তার এই চ্যালেঞ্জকে বীরের মত গ্রহণ করে জবাব দিল একটি বছর ১৪ বয়সের নাবিক। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সিনেমা বন্ধ না করাতে সেই সাহসী নাবিকটি এগিয়ে গিয়ে সাদা পর্দ্দাটি পত্ পত্ করে ছিঁড়ে ফেললো।

পরদিন ভোর পাচটায় বাছাই করা ৫০ জনকে গ্রেপ্তার ক'রে দূরের একটি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তাদের দারুণ রৌদ্রের ভিতর খালি গায়ে বসিয়ে রাখা হল। সামনে বেয়নেট হাতে মোতায়েন থাকল মারাঠা সৈন্য। তিনদিন একটানা উপবাসের পর এই বর্ব্বরতা সহ্য করতে না পেরে ষ্ট্রাইক কমিটির প্রেসিডেণ্ট এম, এস, খান অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন।

ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন অজ্ঞান অবস্থাতেই খানের উপর বেয়নেট চার্জ্জ করার যখন হুকুম দিল, তখন আর সহ্য করতে না পেরে ১৪।১৫ বছরের একটি ছেলে পায়ের জুতো খুলে ক্যাপ্টেনের ওপর ঝাঁপিয়েপড়ল।

মারাঠা সৈন্যরা কিছুতেই বেয়নেট চালাতে রাজী হল না। তাই তাদের ৪৫ জনকে সেই দিনই বিকেলে কল্যাণ বন্দী শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

এই ঘটনার পর থেকেই আমাদের সরিয়ে ইষ্ট ক্যাম্পে পাঠান হ'ল। এইভাবে আমাদের বিরাট ঐক্য ও মনোবলকে বাইরে

থেকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবার চেষ্টা করা হল। এক গভীর রাতে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে 'গার্ডরুমে' নিয়ে গিয়ে আমার বিছানাপত্র, কিট ব্যাগ সব তন্ন তন্ন করে তল্লাস করা হয়। কোনরূপ সন্দেহজনক কিছুই না পাওয়ায় নানারূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। "দেশ স্বাধীন হ'লে কি ধরণের নেভি আমি চাই, কমিউনিষ্ট মতবাদ কেমন লাগে ইত্যাদি প্রশ্ন করেও যখন কোন সন্তোষজনক জবাব পেল না তখন, সরাসরি আমায় প্রশ্ন করে—"কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট কিনা" ?

পরে বুঝলাম এই সব প্রশ্নের ভিত্তিতেই আমার বিরুদ্ধে চার্জ্জ আনা হয়েছে। এই ধরণের প্রশ্ন তারা আমার মত আরও অনেককে করেছিল।

এর পর সুরু হ'ল মামলা। আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন একদিন এসে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়ে দিয়ে গেলেন—নৌ-সৈন্যদের আমরা বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছি এবং অহিংস উপায়ে বিদ্রোহে যোগদান করেছি।

এরপর সপ্তাহখানেক পরে মুলান্দ ক্যাম্প থেকে আধ মাইল দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে দু'জন দু'জন ক'রে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে আমার কির্ট ব্যাগ, ট্রাঙ্ক, কাপড়চোপড় সমস্ত কিছু জোর করে কেড়ে নেওয়া হ'ল। তারপর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়িয়ে শোনাবার পর কারাদণ্ডের হুকুম হ'ল।

আমাদের ৬ জনকে বোম্বাই থেকে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিস দিয়ে বাংলার জেলে পাঠানো হ'ল। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সমস্ত পথ আমরা মুখরিত ক'রে তুললাম। ষ্টেশনে আমাদের দেখে এবং আমাদের মুখে রাজনৈতিক ধ্বনি শুনে রীতিমত ভীড় জ'মে

গেল। দেখে-শুনে আমরাও সোৎসাহে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলাম। ব'ললাম, কেন আমাদের জেল দেওয়া হয়েছে, ছাড়া পাবার পর আমরা কী ক'রবো।

আমাদের পক্ষ থেকে যুক্ত প্রদেশের সিং ও নাগপুরের একজন বক্তৃতা ক'রে ব'ললেন, "কংগ্রেস ও লীগের নেতারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আমাদের দাবী পূরণ করবেন এবং আমাদের কোন রকম শাস্তি হবে না। দাবী পূরণের তাঁরা কতটা কি করবেন জানি না, তবে শাস্তি আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। শুধু জেল নয়, আমাদের কাপড়চোপড়, বাক্স পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। আমাদের অনেক মাইনে বাকী আছে, এক পয়সাও তারা দেয় নি। জেল থেকে বেরিয়ে আবার আমরা লড়বো। স্বাধীনতার জন্যে, দেশের জন্যে প্রাণ ঢেলে দেবো।"

সবাই মিলে আমরা গান ধ'রলাম 'জাগরে হিন্দু, জাগরে মুসলমান, 'দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।' পথে যারাই শুনেছে আমরা নৌ-বিদ্রোহী, দলে দলে তারা ছুটে এসেছে নৌ-বিদ্রোহের গল্প শুনতে।

জেলখানায় এসে প্রথমদিন আমাদের দু'জনকে দেওয়া হ'ল কেরানীর কাজ। বাকিদের কাউকে কাউকে লাইব্রেরীতে। আমাদের আগে যে সব বন্দী নৌ-সৈন্যেরা এখানে এসেছেন, তাঁদের কাউকে সুরকীগুদামে, কাউকে ঘানি ঘরে কাজ দেওয়া হয়েছে। সবাই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী।

দুদিন পরই আমাকে আর পূর্ণ আচার্য্যকে সেলে আটকে রেখে জওয়ার ভাঙতে দেওয়া হ'ল অথচ আমাদের কোনই দোষ ছিল না।

এখানে এসে বিপ্লবী বীর অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, হেম বক্সী, নলিনী দাস, আশু ভরদ্বাজ এবং আরও অনেক দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রথম দিনের আলাপে নলিনী দাস ব'ললেন, 'আমরা চাটগাঁতে যা করেছি এবং আর যা সব বীরত্বের কথা পড়েছি বা শুনেছি, তোমাদের বিদ্রোহের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।'

যাঁরা বাংলার স্বদেশী যুগের অদ্বিতীয় বীর, যাঁদের ভয়ে বৃটিশ শাসকদের বুক কেঁপে উঠতো, নৌ বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের মুখ থেকে এই আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা শুনে সত্যই মনে মনে গর্ব্ব অনুভব ক'রলাম।

নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রাম

[বোম্বাই]

বোম্বাই নৌ-সেনাদের এই বিক্ষোভকে মিলিটারী রক্তের স্রোতে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ এবং শ্রমিকশ্রেণী অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, তাহারা অসাধারণ প্রতিরোধ করে মিলিটারী ভয়কে জয় করে। একথা সত্য, অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে অনেক জায়গায় গুণ্ডা এবং বদমায়েসেরা লুটতরাজ করেছে এবং পাগলের মত আগুন লাগিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু এই ক'দিনের ঘটনার প্রধান সুর ছিল তিন ঝাণ্ডার মিলন—সর্ব্বত্রই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামের প্রতীক হয়ে যেন তিন ঝাণ্ডা দেখা দেয়। সামরিক বিভাগের নতুন শক্তির রক্তের সঙ্গে অসামরিক ভাইয়ের রক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম মিলন।

২১ শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকালেই চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে ক্যাসল ব্যারাকে বন্দী ধর্ম্মঘটীরা বৃটিশের গুলির প্রত্যুত্তর দিয়েছে, এডমিরাল গডফ্রে সমস্ত ভারতীয় নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করবার ভয় দেখিয়েছে। সদার্ণ ডিভিশনের কমাণ্ডার জেনারেল লকহার্ট টার্ডন হলের মধ্যে তার 'হেডকোয়াটার্স' স্থাপন করেছে। সামান্য এবং নায্য অধিকার দাবী করার অপরাধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরাট সামরিক বল কি ভারতীয় নাবিকদের পিষে মেরে ফেলবে? নৌ-ধর্ম্মঘটের কেন্দ্রীয় কমিটি তাই সাম্রাজ্যবাদের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দেবার জন্য বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে হরতাল ও ধর্ম্মঘট করে সমর্থন জানাতে ডাক দিল। সন্ধ্যায় অ্যাপেলো বন্দরে

দলে দলে লোক ভিড় করে, আগ্রহ ও উদ্বেগের সঙ্গে বন্দী এবং বন্দরের জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। জাহাজ থেকে ছোট লঞ্চে করে নাবিকরা কূলে এসে দর্শকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করতে থাকে। লঞ্চের পর লঞ্চও ভর্ত্তি হয়ে গেল ফল, মিষ্টান্ন ও সিগারেটে। ডক থেকে ফিরছিল কয়েক দল। কলবাদেবী অঞ্চলে—আসতেই পুলিশ তাদের বাধা দেয় ফলে পুলিশের সঙ্গে ছোটখাট একটি সংঘর্ষ হয়ে গেল। পুলিশ দুইবার গুলি চালায়। গভীর রাতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরের দিন বোম্বাইতে হরতাল করতে বারণ করেন। নাবিকদের দাবী সমর্থন করে, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক এবং জনসাধারণের কাছে সাধারণ হরতালের আহ্বান জানালেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে "প্রোপাগাণ্ডা ভানে" করে, শ্রমিক মহল্লায় বক্তাগণ নাবিকদের বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপের বর্ণনা করেন এবং তাঁহাদের জীবনসংশয়ের কথা বলেন। ভারতীয় নাবিকদের বিপ্লবী কর্ম্মের সংবাদে চারিদিকে তুমূল আনন্দধ্বনি হতে থাকে। ইতিমধ্যেই ফাগুসান রোডের চারটি মিলে 'লাইট সিফ্‌টে যাহারা কাজ করতে এসে ষ্ট্রাইক করে বসে থাকল। সমস্ত অঞ্চল একেবারে শান্ত হয়ে গেল। সকালে দেখা গেল মিল গেটের সামনে ভিড় করে শ্রমিকরা দাড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একটি মিলের একটিও চাকা ঘোরেনি। তিনটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এবং ছোটবড় সমস্ত ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, কেহই বাদ নেই।

তিন লক্ষের উপর শ্রমিক ষ্ট্রাইক করেছে, ধ্বনি দিতে দিতে শ্রমিকরা অনেক শোভাযাত্রা প্রদক্ষিণ করে। কামগড় ময়দানে এমনি একটি সভায় কমিউনিষ্ট নেতা এস এ, ডাঙ্গে বক্তৃতা করেন।

প্যারেল ওয়ার্কসপের শ্রমিকদের শোভা যাত্রাগুলি তিন ঝাণ্ডা লইয়া বাহির হয়। এই শোভাযাত্রাগুলি শান্তিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই চলতে থাকে। পোর্ট অঞ্চলে এই রকম একটি শোভাযাত্রার উপর হঠাৎ মিলিটারী লরী ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুইজন শ্রমিক চাকার তলায় পড়ে গুঁড়া হয়ে সেখানেই মারা যায়। শ্রমিকরা তাহাদের সঙ্গীকে বাঁচাতে এগিয়ে এল এবং তারপরই দু'টি মিলিটারী লরীর উপর জনতার আক্রমণ হয়। লরী দুইটি ভস্মীভূত হয়ে গেল। এরপরই আসে বৃটিশ মিলিটারী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুলী চলে—অনেকে মরল অনেক আহতও হল। ইহাদের সাহায্যে এগিয়ে এল মুসলিম লরী ড্রাইভাররা, তাহারা আহতদের হাসপাতালে পাঠাবার জন্য লরীও দিল। লীগ এবং কংগ্রেস নেতারা এগিয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না। বললেন ইহার সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব নেই সুবিধা হল সরকারের। নৈতিক সমর্থন মিলল অমানুষিক অত্যাচারের। কমিউনিষ্ট পাটির হেড অফিসে পুলিশ "চড়াও" করে। ফোর্ট এলাকায় বে-পরোয়া গুলি চালায় পুলিশ। মুহূর্ত্তের মধ্যে সারা শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত! ছোট খাট কয়েকটা সংঘর্ষ হয় মাঝে মাঝে। নির্ব্বিচারে গুলি খায় মানুষ। দ্রুতগামী লরীতে করে গুলিবৃষ্টি করতে করতে মিলিটারী উদ্দাম হয়ে উঠল সহরের রাস্তায়। বিকালে ৪টায় দাদার রোড ধরে মিলিটারী লরী আসতে থাকে। বিনা কারণে এখানে মিলিটারী বার বার গুলী ছোড়ে। প্যারেল মহিলা সঙ্ঘের সেক্রেটারী কুসুম রনডিভে, কোষাধ্যক্ষ কমল দোন্দে এবং অহল্যা রঙ্গনেকার রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। এই সময় কমলের দেহ ভেদ করে একটি বুলেট চলে যায়। কুসুমের পায়ে গুলি লাগে। কমলের

স্বামী স্ত্রীকে বাঁচাবার ব্যর্থ আশায় নিজে তাঁহাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। কিন্তু নিষ্ফল। বুলেট জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। যে সমস্ত লোক ঘরের দাওয়ায় অথবা দোকানে বসে ছিল তাহাদের গায়েও গুলী লাগে। যাহারা গুলীচলনা দেখেছে তাহারা সে দৃশ্য ভুলতে পারবে না—চোখের সামনে কেমন করে মানুষের রক্তে রাস্তা লাল হয়ে গেল। রেষ্টুরেণ্টে বসে থেকে মানুষ মরেছে। সেলাই করতে করতে গুলি খেয়েছে দর্জ্জি। একটি ছোট ছেলে এবং তার বোন দুধ আনবার জন্য দোকানে যাচ্ছিল। হঠাৎ মিলিটারীর একেবারে সামনাসামনি। 'জয়হিন্দ' চীৎকারের সাথে সাথেই বুলেটের মুখে উত্তর মিলল। ছিন্ন পাতার মত শিশুরা মাটিতে লুটায়ে পড়ে আর্ত্তনাদ করতে থাকে।

সেই কিশোরী মেয়ের পরণের শাড়ী—রক্তে একেবারে লাল হয়ে উঠল। কপালের ঠিক মাঝখানে বুলেটের রক্তিম ক্ষত জ্বল জ্বল করছিল—যেন এক অপরূপ সুন্দরী নববধূ! মৃত্যু পথযাত্রিনী কিশোরীর চোখে মুখে সেদিন সাহস ও সারল্যের এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। ফিরবার পথে কান্নায় ভেজা মুখগুলি ভীষণ কঠিন হয়ে উঠেছিল; দাঁতে দাঁত পিষে চাপা আক্রোশে তাহারা ফেটে পড়ল—"দুষমণ"!

সংবাদে জানা যায় যে দুইজন সশস্ত্র-কনস্টেবল এবং একজন সব-ইনস্পেক্টর ও প্যারেলে বুলেটে আহত হয়। ডি-লাইল রোডে শ্রমিকেরা একশত সুসজ্জিত পুলিশের সঙ্গে পুরো তিন ঘণ্টা ধরে সামনাসামনি যুদ্ধ চালায়। দুইবার পুলিশকে চম্পট দিতে হয়েছে। চারজন কনস্টেবল পোষাক খুলে পালিয়ে যায়। একজন আহত শ্রমিককে একজন জিজ্ঞাসা করে, "কি হয়েছে"? পরিষ্কার উত্তর

এল, "একটুরজন্য ফস্কে গেল।" এইভাবে যে দিনের আরম্ভ হয়েছিল শ্রমিকদের সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক বিক্ষোভের মধ্যে তা শেষ হয় নৃশংস নরহত্যার মধ্যে।

বৃহস্পতিবার বোম্বাই ছাত্র ইউনিয়ন শুক্রবার একদিনের জন্য সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান জানান। অধিকাংশ স্কুল কলেজ থেকে সাড়া এল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আজাদ ময়দানে এক সভা করে। গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা নাবিকদের সাহায্যের জন্য টাকা তোলেন।

শুক্রবার সারা রাত্রির জন্য সাঁজবাতি আইন জারী হল। সারারাত্রি সুসজ্জিত মিলিটারী লরী নিস্তব্ধ শূন্য রাস্তায় টহল দেয়। সকালে খবরের কাগজে বাহির হয়, সমস্ত নাবিকেরা সর্দ্দার প্যাটেলের কথায় রাজী হয়ে জাতির হাতে নিজেদের সমর্পণ করেছে এবং ধর্মঘট উঠিয়ে নিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের কাজে ফিরে যাবার মত মনোভাব ছিল না। তাহাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজন এখনো মর্গে পড়ে আছে। মদনপুরা, নর্থ ব্রুক গার্ডেনস এবং ডালকান রোডে সমস্ত ব্যারিকেড উঠল। পুলিশের রক্তাক্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু এবং মুসলমান শ্রমিক এক হয়ে দাড়াল। এখানকার ব্যারিকেড যাতা ধরণের সাধারণ ব্যারিকেড নয়। মোটা মোটা বাঁশকে একসঙ্গে শক্ত করে বেধে রাস্তার উপর বেড়া দেওয়া হয়েছে। মিলিটারী লরী প্রর্যান্ত আটকানো চলে। এই ব্যারিকেডের উপরে লীগ ও কংগ্রেসের ঝাঁণ্ডা বেধে দেওয়া হল। তার পরই লোকজন পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে। যেই মিলিটারী লরী দেখা যায় অমনি রাস্তার মোড় থেকে তীব্র আওয়াজ আসে, লোকজন বাড়ী এবং গলির মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্বাগত

মিলিটারী ইহার পরে ব্যারিকেড ভেঙ্গে চুরে সামনে যাহাকে পায় গুলি করে। সন্ধ্যায় কংগ্রেসের শান্তি-বাহিনীর লরী এল। দুই একটা শান্তির কথা এবং "ষ্ট্রাইক করিও না" বলিয়া শান্তি বাহিনী উধাও হল। তারপর এল লীগের ন্যাশানেল গার্ডের লরী। ইহারাও ঠিক আগের দলের মতই ধ্বনি করতে থাকে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিকাল বেলা পুলিশ পাড়ায় পাড়ায় এবং শ্রমিক অঞ্চলে ঢুকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এই পুলিশই ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তির কাছে দিশাহারা হয়ে দুইদিন আগে পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। আজ মদগর্ব্বে পুলিস যে সব কথা ভুলে গেছে। শনিবার প্যারেল এবং দাদারের যে সব হাজার হাজার লোকের আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধব নিহত অথবা আহত হয়েছিল তাহারা কে, ই, এম হাসপাতালের প্রাঙ্গণে ভিড় করে। এই আহত-নিহতের সংখ্যা এত বেশী যে হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা আর পেরে উঠেছিল না। দর্শকরা আত্মীয়-স্বজনকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। এই হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং মেডিকেল ছাত্ররা যে রকম প্রাণ এবং ভালবাসা দিয়ে দিনরাত আহতদের শুশ্রূষা করেছে তাহাতে সব চাইতে বেশী প্রশংসা তাহাদেরই প্রাপ্য।

……এই (নৌ-বিদ্রোহ) ধর্ম্মঘটের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য
খুবই বেশী।·· ভারতীয় সৈন্যদের মন কোন্‌দিকে
—এই ধর্ম্মঘট তাহা প্রমাণ করিয়াছে।
বৃটিশরা ভারতীয় সৈন্য এবং
ভারতীয় জনগণের মধ্যে
যে লৌহ-প্রাচীর
তুলিয়াছিল তাহা
ধূ লি সা ৎ
হইয়াছে।

—পণ্ডিত নেহেরু—

বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে

[কলিকাতা]

বোম্বাই নৌ-সেনাদের ধর্ম্মঘটের খবর পাওয়া মাত্র মাজের হাট ক্যাম্পে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ৩০০ জন নৌ-সেনা শান্তিপূর্ণ ভাবে ধর্ম্মঘট করেন। ১০ জন প্রতিনিধি লইয়া তাঁহাদের একটি ধর্মঘট কমিটির গঠিত হয়। ধর্ম্মঘট কমিটির এক সভায় বোম্বাইয়ের ফ্লাগ অফিসার কমাণ্ডিং এর ঘোষণার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং কমাণ্ডিং অফিসারের হুমকি প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়, কর্ত্তৃপক্ষ যদি গোলাগুলি চালাইয়া নৌ-বাহিনীর শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর প্রত্যেকটি লোক তার উচিত জবাব দেবে।

এই ধর্ম্মঘটি নৌ-সেনারা বোম্বাইয়ের হতাহতদের পরিবার বর্গের সাহায্যার্থে একটি রিলিফ কমিটিও গঠন করেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় কলিকাতাস্থিত ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পাঁচশত লোকের সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

(১) যতদিন আমাদের দাবী পূরণ না হইতেছে ততদিন আমরা শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট চালাইব।

(২) ফ্লাগ অফিসার কমাণ্ডিং ও ভারত গভর্ণমেণ্টের তথাকথিত উচ্চ অফিসারগণ এই নৌ-বাহিনীকে ধ্বংস করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে ইহা কাহার নৌ-বাহিনী। ইহা ভারতীয় নৌ-বাহিনী। ইহা জাতীয় শক্তি।

ইহার উপর বর্ত্তমান সরকারের রায় দিবার কোনরূপ অধিকার নাই। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহা তাহারই দায়িত্ব। ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে যে, আমরা কাজে যোগ দিবার সময় দেশ রক্ষার জন্য সরকারের হাতে নিজেদের জীবন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; অন্যান্য জাতির সহিত সমান স্তরে বাস করিব ইহাই আমাদের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য আমরা নিজেদের কোরবাণী করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা মিঃ এটলীকে হস্তক্ষেপ না করিতে অনুরোধ করিতোছ। আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার কিছু না বলিলেও চলিবে। এই কাজের জন্য আমাদের দেশীয় নেতারা রহিয়াছেন। বর্ত্তমান সরকার ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাউক।

(৩) আমরা পুনরায় ভারত গভর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে এই সকল হুমকির ফলে সমস্ত সৈন্যের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।

(৪) বোম্বাইয়ে বে-সামরিকদের মধ্যে যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং জন-সাধারণকে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

(৫) সহকর্ম্মী ও জনসাধারণকে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি।

রাত্রিতে বেহালায় অবস্থিত ধর্ম্মঘটী নৌ-সেনাদের ব্যারাকে এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাত্রি ৯টা হতে সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা সমগ্র ছাউনিটি ঘেরাও করে ফেলা হয়। সোমবার প্রাতে ছাউনির চারপাশে সঙ্গীন উঁচু অবস্থায় শত শত সৈন্য মোতায়েন দেখা যায়। লরীতে দলে দলে সৈন্য টহল দিতে থাকে। পরে

মিঃ জিন্নার সহিত আলাপ আলোচনার পর তাঁহারা ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হল।

* * * * *

২৩শে ফেব্রুয়ারী নৌ-সেনাদের বিদ্রোহের সমর্থন জানাতে এগিয়ে এল কলিকাতার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, ছাত্র ও নাগরিকবৃন্দ। সাম্রাজ্যবাদী গডফ্রে ও তার দোসরদের ঔদ্ধত্বের প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ! অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কি অধিকার আছে যে তারা ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে কামানের মুখে নিশ্চিহ্ন করবে? কামানের মুখে যদি কাউকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে হয়, তবে সেই জুলুমবাজ বৃটিশকে যারা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে অনাহারে রেখে হত্যা করেছে, যারা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক জীবন গত দেড়শো বছরে আমাদের সব কিছু চুরমার করেছে।

নৌ-বাহিনীর মৃত্যুভয়হীন ভাইগুলির শেষ আহ্বান: বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় আমরা মাথা পাতিয়া দিই—ইহা কোন দেশ ভক্তই চাহিতে পারেন না।" দেশভক্ত নেতাদের কানে এ ডাক পৌছাল না। কস্তু ভারতবাসী মরে নাই। দেশের শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষকে এই লজ্জা সর্ব্বাধিক পীড়া দিয়াছে। তাই বীর ভারতবাসীর প্রতিভূ হয়ে তাহারাই সকলের আগে দাড়িয়েছে। মৃত্যু-পথযাত্রী নাবিক ভাইদের ম্লান হতাশার সম্মুখে তাহারা আশার গর্জ্জন তুলেছিল—আমরা তোমাদের ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না, তোমদের সংগ্রাম যে আমাদেরই সংগ্রাম। কলিকাতার লক্ষাধিক শ্রমিক ট্রেণ ও ট্রাম বন্ধ করে কারখানা বন্ধ করে সেই আহ্বানের প্রতিধ্বনি

ভুলেছিল—ভুলি নাই, ভুলিতে পারিব না। কলিকাতার স্কুলের ছাত্র পর্য্যন্ত এই সংগ্রামে যোগ দিয়া প্রতিজ্ঞা নিয়াছে—সাম্রাজ্য-বাদের প্রতিটি আঘাতের প্রতিঘাত করিবার জন্ম তাহারা প্রস্তুত। ভারতবাসীর মেরুদণ্ডকে বাঁকিতে দেওয়া হবে না।

অস্ত্রের মুখে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রের জবাব দিতে হবে। নৌ-সেনাদের প্রত্যেকটি লড়াই দেশবাসীর ঘুমন্ত মনেও আশা জাগিয়ে তুলল। আবার যদি ভারতের বুকে আর একটা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়ে ওঠে, হাতে অস্ত্র নিয়ে বৃটিশের কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতবাসী বলবে "কুইট্ ইণ্ডিয়া" "জয়হিন্দ"—

ওয়েলিংটন স্কোয়ার। সভা আরম্ভ হবার অনেক আগে হতেই লোক এসে বসেছে। ছেলেমেয়ে বুড়ো সবাই এসে জড় হয়েছে মাঠে। সারা কলকাতা জেগে উঠল নৌ-সেনাদের তাজা প্রাণের আহুতি ও জাগ্রত যৌবনের কথা শুনে। শিউরে উঠল মিলিটারীর বর্ব্বরতার কথা শুনে। ক্ষুব্ধ জনতা ছুটলো নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থন জানাতে। সারা সহর নেমে আসছে রাজপথে। খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজ, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, বেলিয়াঘাটা, ইন্টালীর কারখানায় কারখানায় ভোর হতেই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়ে গেল। ট্রামের শ্রমিকরাই প্রথম পথ দেখায়। ভারতিয়া, ম্যাকিন্‌তোশ, বার্ণ, এয়ার কন্‌ডিশানিং কর্পোরেশন, বেরুট্ কমেন্‌স, অন্নপূর্ণা মেটাল, ভারত ব্যাটারী, লেসলি (ফোর্ড), স্ম্যাক্‌সবি, ইণ্ডিয়া ফ্যান্, বেঙ্গল পটারী কেউই বাদ নেই।

কলিকাতায় ট্রাম, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের স্টোর, সাইন ওয়ার্কশপ, কর্পোরেশনের ধাঙ্গড় ও মেথররাও ধর্ম্মঘটে যোগ দিলেন। শোভাযাত্রা বের হল……মিছিলের পর মিছিল চলল

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। চারিদিক থেকে শ্লোগান উঠেছে: "জাহাজী পল্টনকী মাং পুরী করো"—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, "কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট এক হও।"

এই বিরাট জনসভায় কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে ডাঃ রণেন সেন গর্জ্জে উঠলেন: "আজ সমস্ত ভারতবাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাড়াইয়া স্বাধীন ও সুখী ভারত গঠন করিতে চায়। বোম্বাইয়ের এই বিদ্রোহের মত ভারতে ১৮৫৭ সালে আর একবার সিপাহি বিদ্রোহ হইয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমল আজ টলটলায়মান। তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্ষোভ চলিতেছে।"

"নৌ শিক্ষার্থীরা যুবক এবং তাঁহারা বীর বিক্রমে বৃটিশ আমলা তন্ত্রের বিপুল রণসম্ভারের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। এই খবর কলিকাতায় আসিবামাত্রই কলিকাতা ও আসে পাশের এক লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ বন্ধ করিয়া নৌ শিক্ষার্থীদের সমর্থন জানাইয়াছেন। আমরা বৃটিশ আমলাতন্ত্রকে একথা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতেছি, যদি তোমরা এই নৌ শিক্ষার্থীদের কাহাকেও গ্রেপ্তার কর এবং তাহাদের দাবী মানিয়া না লও তবে ভারতের মজুরশ্রেণী সারা ভারতে এমন আন্দোলন আরম্ভ করিবে যাহাতে তোমরা ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।" একথা বলেন কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী।

তারপরই এলো ছাত্ররা। সমস্ত স্কুল-কলেজ ধর্ম্মঘট করে এসে জড়ো হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ হইতে মিঃ মীর হোসেন, আজাদহিন্দ ফৌজের অজিত বসুমল্লিক আরও অনেকে ধর্ম্মঘটী নাবিকদের ন্যায্য দাবী সমর্থন করেন।

"এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানে আমরাও পিছাইয়া নাই। তাহার প্রমাণ মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী দোন্দে প্রাণ দিয়াছেন। কুসুম রণডিভে আহত হইয়াছেন।" একথা বলেন ছাত্রীকর্ম্মী অলকা মজুমদার।

২৩ শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার জনগণের বিদ্রোহী মনকে গ্রাস করেছে, বারবার দেশের প্রান্তে প্রান্তে এসে হাজির হয়েছে রসিদ আলি দিবসে নৌ-বিদ্রোহীদের লড়াইয়ে ডাক ধর্ম্মঘটে, রেলধর্ম্মঘটে কাশ্মীরে আর ত্রিবাঙ্কুরে—শত শত শহীদের রক্তের প্রতিশোধ খুজছে অশান্ত জনতা। তাদের আত্মা আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে বাতাসে। তারা আজ ফরিয়াদ-করেছে—আজকের এই গোলক ধাধা থেকে দেশের হিন্দু মুসলমান মুক্তিলাভ করবে কখন? প্রতিধ্বনি বলছে: কখন?

মাদ্রাজ

১৯৪৬ সাল ২৫শে ফেব্রুয়ারী। ট্রেডইউনিয়নে কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পাটির ডাকে সারা সহর নৌ সৈন্যদের সমর্থনে হরতাল ও ধর্ম্মঘট করে। বিদ্যুতের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বোম্বাই নৌ সৈন্যদের বিদ্রোহের কাহিনী: করাচীতে ১৪।১৫ বছরের নৌ-শিক্ষার্থীরা 'হিন্দুস্থান' জাহাজ থেকে কামান দিয়ে বৃটিশের ব্যারাক উড়িয়ে দিয়েছে, ক্যাসেল ব্যারাকের নৌ সৈন্যরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের দখলে এনেছে। সারা সহর থেকে সাহেবেরা নাকি ভয়ে পালিয়ে গেছে, বোম্বাই সহরের রাস্তার ও বস্তিতে বস্তিতে সরকারী ফৌজের সঙ্গে লড়ছে বিপ্লবী-শ্রমিক। ছাত্র ও নাগরিকবৃন্দ ইট আর সোডার বোতলের সাহায্যে লড়াই করছে। ক্যাসেল ব্যারাকের বন্দী নৌ

সৈন্যরা প্রতীজ্ঞা করেছে সমস্ত জীবনের বীনিময়ে ও এই অস্ত্রাগার সাদা চামড়াদের হাতে তুলে দেবো না। খবর এসেছে এই বীর দশ হাজার নৌ সৈন্যদের ধ্বংস করবার জন্য রাজকীয় নৌ বহরের কয়েকখানা জাহাজ বোম্বাই অভিমুখে রওনা হয়েছে।

কিন্তু দেশবাসী উহাদের মরতে দিবে না। মাদ্রাজের বীর ছাত্র হিন্দু-মুসলমান লক্ষ লক্ষ নাগরিক তাই হরতাল ও ধর্ম্মঘট করে উহাদের অমুল্য জীবন বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এলেন। সহরে ট্রাম ও মোটর ট্রান্সপোর্ট, সমস্ত ছাপাখানা, মোটরকারখানা, রেলওয়ে লোকো শেড এবং বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিলেন। ছাত্ররা এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করে সারা সহর প্রদক্ষিণ করে। বরাপুতম, ফোর্ট রেল ষ্টেশনের নিকট পুলিশের লোকের সাথে জনতার কয়েকটি সংঘর্ষ হয়—১৭ বছরের একটি বালক এই সংগ্রামের প্রথম আহুতি। অনেকে আহতও হলেন।

পিপল্‌স পার্ক, নেপিয়ার পার্ক. লোন স্কোয়ার ও মাউন্ট রোডে অনেকগুলি সভা হয় এবং প্রত্যেকটি সভায় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাকিংহাম ও কর্ণাটক মিলের শ্রমিকরা বেড়িয়ে এলেন তাদের সাথে যোগ দিলেন গভর্ণমেণ্ট প্রেস ও এম, এস, এম রেলওয়ে প্রেসের শ্রমিকরা।

কংগ্রেসের কথায় শ্রীযুক্ত কলিয়াপ্রাণের নেতৃত্বে কিছু কংগ্রেসী-লোক এক স্থানে লীগ পতাকা নামিয়ে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে কিন্তু এই বিরাট শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের কাছে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ভারতীয় ছাত্র কংগ্রেসের নেতৃত্বে তিন হাজার ছাত্র এক শোভাযাত্রা সহকারে হাইকোর্টের প্রাঙ্গানে এক সভা করেন।

এই সভায় তারা কমিউনিষ্ট বিরোধী বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হন। এরপরই লোন স্কোয়ার থেকে ৫০ হাজার শ্রমিকের এক শোভা যাত্রা তিন ঝাণ্ডা সহ তিলক ঘাটে সমবেত হয়। সভায় ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের জনৈক প্রতিনিধি-বলেন, "আপনাদের হিন্দু মুসলমান একতার জন্য আমি আনন্দিত। ইন্দোনেশিয়াতে আমাদের একতা ছিল বলিয়াই আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করি; আমরা এখন তাহা রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি।"

আরও ধর্ম্মঘট

বোম্বাই নৌ ধর্ম্মঘটে সহানুভূতি জ্ঞাপন করে ত্রিচিনপল্লীতে হরতাল প্রতিপালিত হয়। অধিকাংশ ছাত্রই ধর্ম্মঘট করে শোভাযাত্রা বের করেন। ধাঙ্গররা ও এই ধর্ম্মঘটে যোগ দেন। বাস ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল ও বন্ধ ছিল। গোল্ডেন রকের শ্রমিকরা ও ধর্ম্মঘট করেন।

মিল কামদার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বোম্বাইয়ে গুলী চালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য ২৫শে ফেব্রুয়ারী একদিন ধর্ম্মঘট করবার আহ্বানে সেদিন আমেদাবাদের ৫টি কাপড়ের মিলে ৫হাজার শ্রমিকরাও ধর্ম্মঘট করেন।

ভারতীয় নৌ বাহিনীর সার কারস্ ব্যারাক ও অনান্য ইউনিটের প্রায় ৬০০ নৌ শিক্ষার্থীরা ধর্ম্মঘট করেন।

ভারতীয় নৌ শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনার্থে তিপনুলঘেরীর এক কারখানায় প্রায় ১০০শত ভারতীয় সৈন্য ২৫শে ফেব্রুয়ারী

ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেন। প্রকাশ, ভারতীয় সৈন্যদের (আই ও আর) এক শোভাযাত্রা তাহাদের বাসস্থান থেকে ধ্বনি দিতে দিতে কারখানার দিকে অগ্রসর হয়।

ভারতীয় নৌ বাহিনীর উপকূলস্থিত জাহাজ ভালস্বরা ও ধর্ম্মঘট করে।

দিল্লী প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে আহূত এক জনসভায় বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার তদন্তের দাবী করা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় বিমান ও নৌ বাহিনীর সৈন্যরা এক সহানুভূতি সূচক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেন। ইউনিটের কমাণ্ডার তাঁহাদের প্রথমে অনেক ভয় দেখাতে চেষ্টা করে হতাশ হয়, সৈন্যরা সম্পূর্ণ অহিংস ও নিরুপদ্রব থাকে এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাদের . দাবী দাওয়া পেশ করেন। দাবীগুলির মধ্যে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ, ধর্ম্মঘটীদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করা আজাদহিন্দ ফৌজ সৈন্যদের মুক্তি, ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে আনীত মীমাংসা প্রত্যাহার, নেতৃবৃন্দ ও বিমান বাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে ঘটনা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা অন্যতম।

হিন্দুস্থান জাহাজের উপর

[করাচী]

নৌ-সেনাদের ধর্ম্মঘটের খবর করাচীতে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই "চমক" হিমালয় জাহাজ, হিন্দুস্থান ও ট্রাভানকোরের নৌ-সেনারা ধর্ম্মঘট সুরু করে। সকালবেলার প্যারেডের সংকেত হ'লে তাঁহারা কেহই হাজির হয়নি এবং কাজ করতে অস্বীকার করে। ২১ শে ফেব্রুয়ারী বোম্বায়ে নৌ-সেনাদের উপর গুলী চালানোর সংবাদ এখানে পৌছিবামাত্র "হিন্দুস্থান" ও "ট্রাভানকোরের" নাবিকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

ঐ দিনে বোম্বায়ে ক্যাসেল ব্যারাকের তিনশত নৌ-সেনারা "ভারতীয় নৌ-বাহিনী" ও ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষার্থে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়।

কেন্দ্রীয় ষ্ট্রাইক কমিটির সতর্কবাণী "প্রস্তুত থাক" অবস্থিত হিন্দুস্থান জাহাজের নাবিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধী করে স্থানীয় মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষ বেলুচ রেজিমেণ্টকে "হিন্দুস্থান" আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে গুলী চালাতে তারা অস্বীকার করে। তারপর এল গুর্খা সৈন্যেরা। তারাও ফিরে গেল। ইতিমধ্যে জাহাজের নাবিকরা তৈরী হয়ে নিল। যে যার হাতে তুলে নিল বন্দুক, টমি গান, গোলা এই সব। জাহাজের ক্যাপটেনকে বলা হ'ল জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে। সেই সময় ক্যাপটেন সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ রিভালবারের আওয়াজ করে। এই সঙ্কেতে ছিল গোরা সৈন্যদের আক্রমণের

নির্দ্দেশ। হিন্দুস্থান জাহাজ থেকে সিগন্যাল করে গোরা সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া হয়, "যদি তোমরা বাঁচতে চাও তাহলে সরে যাও।" কিন্তু গোরা সৈন্যরা কালা আদ্মীর এই চ্যালেঞ্জকে উপহাস করে ভয় দেখাবার জন্য মেসিনগান ছোড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এই মেসিনগানের জবাব এল করাৎ করাৎ করে তিনশ নাবিকের বন্দুক থেকে। গোরা সৈন্যরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারপর সামান্য ১৫।১৬ বছরের বালক নাবিকদের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। কিছুক্ষণ বেশ থমথমে ভাবের মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

এরপর হঠাৎ গোরাসৈন্যরা আবার এগিয়ে এল। একদল এমবারকেসান্ হেডকোয়াটারের মাথায় আশ্রয় নিল। এখান থেকে মেসিনগান চালান সুবিধা। চারিদিক বালুর বস্তার ভিতর বসে তারা আবার গুলী চালাল। তিনজন নাবিক নিহত হয়। রক্তাক্ত মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে মৃত ভাইদের মুখ স্মরণ করে উত্তেজনা ও ঘৃণায় নাবিকরা মরিয়া হয়ে উঠল।

ডক এলাকায় জড় হয়েছে পোর্ট শ্রমিকরা, তারা বলাবলি করছেঃ ওরা আমাদের ভাইদের মেরে ফেলবে। কিন্তু তার আগে ওদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের হাতে অস্ত্র থাকলে……
হিন্দুস্থান জাহাজের নাবিকরা এইবার তাদের শেষ অস্ত্র কামান দাগল। দশ মিনিটের মধ্যে তারা চারটে গোলা ছুড়ল। বেগতিক দেখে গোরা সৈন্যরা পালিয়ে গেল। এবারও 'হিন্দুস্থান' জয়ী হল। আনন্দে শ্রমিকরা চিৎকার করে উঠল। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

সারারাত ধরে মিলিটারী ডকের চারিপাশে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জমা করে। গোলা, বারুদ, ব্যাটারী, হেভী বোমা আরও কত কি! কিমারীর চারিদিকে ঘিরে ফেলা হল মিলিটারী ট্রাক, মেসিনগান,

ভারী টাঙ্ক আর গোরা সৈন্য দিয়ে। বিপদ্জ্জনক এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে দিয়ে শহর থেকে ডক এলাকা বিচ্ছিন্ন করে রাখা হল। মাত্র তিন'শ নাবিকদের দমন করার জন্য এত বিরাট আয়োজন করা হল।

২২শে ফেব্রুয়ারী। কুকুরের মত আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়. এই বিবেচনা করে 'হিন্দুস্থান' আবার তৈরী হ'ল যুদ্ধ করার জন্য। তারা জানিয়ে দিল শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মঘট তারা চালিয়ে যাবে যদি গোরা সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করে কিন্তু এর কোন জবাবই এল না। বেলা ১০-২: মিনিটের গোরা সৈন্যরা বর্ব্বরের মত হঠাৎ হিন্দুস্থানের উপর গুলী ছোড়ে। জাহাজের নাবিকরা এই সময় বেশ খানিকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। বড় বড় মেসিনগান ব্যাটারী এসবের কাছে তাদের কামান বা বন্ধুক কিছুই নয়। তবু তারা তাই নিয়ে যুদ্ধ করল। ২০ মিনিট সমান এই যুদ্ধ চলল। একটুর জন্য 'জেনারেলের' অফিস বেঁচে গেল। ২০ মিনিট সমানে কামান চালাতে চালাতে কামানের নালা ভীষণ গরম হয়ে উঠল। মুখের কাছে একটু ফেটেও গেল। এই অবস্থায় কামান দাগলে যে কোন মূহর্ত্তে 'হিন্দুস্থানে' আগুন লেগে যেতে পারে—সঙ্গে সঙ্গে অনেকের প্রাণও যাবে। এরই মধ্যে ছ'জন নিহত ও ৩০ জন আহত হল। এভাবে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই তারা 'আত্মসমর্পণ' করাই ঠিক করল।

১৫ বছরের একটি নাবিক আত্মসমর্পণের সাদা পতাকা হাতে করে উপরের ডেকে এসে পৌছিবামাত্র একটি ৭৫ মিলিমিটারের সেল তার উপর এসে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এইভাবে হিন্দুস্থান জাহাজের

এই গৌরবময় সংগ্রাম শেষ হয়। সবচেয়ে ছোট শেষ শহীদ নাবিকের খণ্ড খণ্ড দেহের চারিপাশে নাবিকরা এসে জড় হল।

এই বীর শহীদের রক্ত ছুয়ে তারা প্রতিজ্ঞা করল: যে জন্যে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করলে……সে অসম্পূর্ণ কাজ আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সম্পূর্ণ করব।" এই বীর নাবিকদের সংগ্রাম পদ্ধতিতে ভ্রান্তি থাকতে পারে, বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে কিন্তু দেশ ভক্তির অতুল প্রেরণা আর অত্যাচারীদের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণাই যে তাঁহাদের মরবার কঠিন প্রতিজ্ঞায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল সে কথা অস্বীকার করবে কে?

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ভারতীয় ও সামরিক অফিসারদিগকে লইয়া ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের বিদ্রোহের তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল। পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার সৈয়দ ফজল আলি (চেয়ারম্যান সদস্যবৃন্দ) কোচিন রাজ্যের প্রধান বিচারপতি মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মহাজন গুলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলের ক্রুজার স্কোয়াড্রনের ফ্ল্যাগ অফিসার কমাণ্ডিং ভাইস এডমিরাল প্যাটারসন, ভারতীয় চতুর্থ ডিভিশনের সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল টি, রেস, সেক্রেটারী—লেঃ কর্ণেল বিশ্বেশ্বর নাথ সিংহ।

তদন্ত কমিশনের প্রথম সাক্ষী জেনারেল হেড কোয়াটার্সের মোরেল ডিরেক্টরেটের লেপনাণ্ট কর্ণেল মালিক হক নওয়াজ বলেন :

ভারতীয় নৌ-সেনাদের মধ্যে অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতি, রাজনৈতিক প্রচার কার্য্য, নৌ বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং অফিসারদের অযোগ্যতা। তলোয়ারের সংবাদ আদান প্রদান বিভাগের অধিকাংশ ভারতীয় নৌ-সৈন্য শিক্ষিত যুবক। তাহারা সকলেই প্রায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থক। তিনি আরও বলেন—চাকুরীতে পদোন্নতি সম্পর্কে ভারতীয় ও বৃটিশ অফিসারদের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং স্থায়ী অফিসার পদের জন্য আবেদন বাধা নিষেধ সম্পর্কেও তাহাদের অভিযোগ ছিল। স্থায়ী অফিসার পদের জন্য ১৫০০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৬৬ জনকে নিযুক্ত করার বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক কমোডর জন লরেন্স সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন সৈন্যদের সহিত অফিসারদের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতির বন্ধন থাকা উচিত, নৌ-সৈন্যদের বিদ্রোহের প্রাক্কালে সেরূপ কোন অবস্থা না থাকার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।

সেনাবাহিনী ভারতীয়করণ সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে মুহূর্ত্তে তাহারা (অফিসাররা) নিজেদের বাহিনী নিজেরা পরিচালিত করিবার মত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন, আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁহারা তাহা করিতে পারিবেন।

ভারতীয় নৌবহরের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে ফ্লাগ অফিসার কমাণ্ডিং ভাইস এডমিরাল জেঃ এইচ গডফ্রে বলেন যে, একই ধরণের কাজ করা সত্ত্বেও ভারতীয় নৌ-সৈন্যেরা বৃটিশ, ব্রহ্মদেশীয় এবং সিংহলী নৌ-সৈন্যদের অপেক্ষা কত বেতন পাইয়া থাকেন।

দক্ষতার দিক দিয়া ভারতীয় নৌ-সৈন্যরা বৃটিশ নৌ-সৈন্যদের সমকক্ষ, অথচ বৃটিশ নৌ-সৈন্যরা ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশী সুখ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। যে সকল ভারতীয় নৌ-সৈন্য কর্ম্মোপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সেখানে বর্ণবৈষম্য এবং ভারতীয়দের প্রতি অবিচার দেখিয়া বিশেষ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, সৈন্য সংগ্রহের সময় যে সকল বিজ্ঞাপন বাহির হইত, তাহাতে যুদ্ধশেষে সকলকে চাকুরী দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া থাকিত। প্রত্যেক নৌ-সেনারই বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধের পর তাঁহারা স্থায়ী চাকুরী পাইবেন। ভারত

সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের যে সকল চাকুরী খালি হইবে, তাহা মাত্র সামরিক বিভাগের লোকদের জন্য সংরক্ষিত হইবে। সকলকে চাকুরী দেওয়া যে সম্ভবপর নহে এবং নৌ-বাহিনীর খুব অল্প সংখ্যক লোকই যে স্থায়ী চাকুরী পাইতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁহাদের কোনরূপ সতর্ক করা হয় নাই।

খারাপ খাদ্য সরবরাহের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে ঠিকাদারেরা নৌবাহিনীর খাদ্য সরবরাহ করিত। তাদের নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, এই ভয় দেখাইলেই ভাল খাদ্য পাওয়া যাইত। কিন্তু ১৯৪১ সাল হইতে খাদ্য সরবরাহের ভার সামরিক সরবরাহ বিভাগের হাতে আসে। তখন হইতে তাহারা যাহা দিত তাহাই গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও উহা বিদ্রোহ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া এডমিরাল গডফ্রে বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া শিবাজী জাহাজের নৌ-সৈন্যেরা রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ইন্দোনেশিয়া হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের জন্য ভারতীয় জনসাধারণের দাবী সেনাবিভাগেও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের ফলে নৌ-বাহিনীর শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "কয়েকটি জাতি বিশেষ করিয়া ফ্রান্স এই পন্থা অবলম্বন করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে। আমি যদি কোন

জাতির নেতা হইতাম, তাহা হইলে আমিও বিপ্লবের জন্য এই পন্থাই অনুসরণ করিতাম।”

তিনি আরও বলেন যে, গত শরৎ কালেই তিনি অসন্তোষের লক্ষণ দেখিতে পান। তিনি তখন অফিসারদের সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলমাল দেখা দিবে। যত শীঘ্র সম্ভব সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়াই উহার একমাত্র প্রতিকার।

নৌ-সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই যে রাজনীতি ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, সে কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহাদের মতবাদ কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস-বামপন্থী মতবাদের অনুরূপ ছিল। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ত্রিকমদাসের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী রাখার জন্য কোন নৌ-সৈন্যের চাকুরী গিয়াছে বলিয়া তিনি কোন সংবাদ পান নাই।

ভারতীয় নৌ-বহর তদন্ত কনিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে এডমিরাল গডফ্রে স্যার আজিজুল হকের এক রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৯৪৩ সালে আগষ্ট মাসে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব থাকা কালীন স্যার আজিজুল এই রিপোর্ট দেন। তিনি এই রিপোর্টে বলেন, “ভারতীয় নাবিকরা ধর্ম্মঘট করিলে ন্যায়ের দিক হইতে আমরা কখনই উহাকে অন্যায় বলিতে পারিব না। ভারতীয় নাবিকদের মাহিনার বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া ইংলণ্ডের শ্রমিক ইউনিয়নগুলি উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিয়াছে। ভারতীয় নাবিকগণ বৃটীশ নাবিকদের এক-চতুর্থাংশ ও চীনাদের এক তৃতীয়াংশ বেতন পায়। ভারতীয় নাবিকদের দাবী সমান কাজের জন্য সমান বেতন; বর্ণবৈষম্যের জন্য কোনরূপ শোষণ চলিবে না।

হুগলি ও কলিকাতার অধ্যক্ষ তাঁহাদের রিপোর্টে জানিয়েছেন যে ভারতীয় নাবিকরা জাতীয় সরকারে গভীর আস্থা রাখেন। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা কামনা করেন। তাহারা দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

"বিদ্রোহ নয়—মাত্র শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মঘট করা হইয়াছিল।" নৌ-বহর তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে পেটি অফিসার শ্রীযুক্ত সি, পি, নায়ার উপরোক্ত মর্ম্মে মন্তব্য কারেন। তিনি আরও বলেন যে তাঁহাদের ক্যান্টিনের জন্য যে সকল জিনিষ পাঠান হইত, তাহার অধিকাংশই চোরাবাজারে চালান হইয়া যাইত।

হুগলী জাহাজের চীফ পেটি অফিসার শাহনওয়াজ তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি যে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা দিয়া তাঁহার পক্ষে পত্নী ও দুইটী সন্তানের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করা চলে না। ভারতীয় নৌ-বহরে তিনি আজ ১৭ বৎসর ধরিয়া কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমানে অবসর লইলে মাসে তিনি মাত্র ১০৲ টাকা কি ১২৲ টাকা পেন্সন পাইবেন। ষ্টোকার আহমদ খান তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, কি ভারতীয় কি ইউরোপীয় সমস্ত অফিসারই তাহাদের ঠিক কুকুরের মত মনে করেন। খারাপ খাদ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইতে গেলে লেপ্টেনান্ট মাদারল্যাণ্ড একবার তাঁহাকে "জারজ" বলিয়া গালি দিয়াছিলেন।

জব্বলপুর সৈনিক ধর্ম্মঘট

২৭ শে ফেব্রুয়ারী সকালে ৮॥০ টায় প্যারেড থেকে ফিরে এসে জব্বলপুর সিগন্যাল স্কুলের হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে এক বৈঠক ডাকে। বৈঠকে দাবী করা হয়—

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাত আর রুটি সরবরাহ করতে হবে এবং বরাদ্দ বাড়াতে হবে। গোরা সৈন্যদের মত ভাল থাকার ব্যবস্থাও করতে হবে।

ঘরে ইলেকট্রিক বাতি আছে বটে, টাইলের ছাদও আছে—কিন্তু বৃষ্টির ছাটে ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এই বৈঠকে আরও বলা হইয়াছিল, শুধু ভাতা বাড়ালে চলবে না, আসল মাইনে বাড়াতে হবে। একজন ভারতীয় সিপাই মাসে ১৮৲ টাকার বেশী পায় না। সিগন্যাল স্কুলের ছেলেরা অবশ্য মাসে ৭০৲ করে পায়। কিন্তু শুধু সিগন্যাল স্কুলের মাইনা বাড়ালে চলবে না, প্রত্যেকটি ভারতীয় সৈনিকের বেতন বাড়াতে হবে। একজন ভারতীয় সৈন্যকে যে কাজ করতে দেওয়া হয় সেই কাজ করেই একজন গোরা সৈন্য মাস গেলে ২০০৲ টাকা উপায় করে। কেন এমন বৈষম্য থাকবে।

সৈনিকদের ওই বৈঠক বোম্বাইয়ে নৌ-ধর্ম্মঘটীদের ওপর বৃটিশ সৈন্যের গুলি চালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জঙ্গীলাট অকিন্‌লেকের উদ্ধত বেতার বক্তৃতায়ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। দুর্ভিক্ষের দিনে বিজয় উৎসবের নামে ভারত গভর্ণমেণ্টের কোটি কোটি টাকা খরচের প্রস্তাবের বিরোধিতাও তারা করেন। সবাই চেয়েছিল এই টাকা দুর্ভিক্ষের জন্য খরচ করা হোক এই সব দাবী-

গুলিতে যখন কর্ত্তৃপক্ষ কাণ দিল না তখন তারা ধর্ম্মঘটের অস্ত্র বেছে নেয়।

এরপর কংগ্রেস লীগ ও কমিউনিষ্ট পতাকা হাতে এক বিরাট মিছিল নিয়ে মিলিটারী ছাউনী থেকে ৪ মাইল দূরে জব্বলপুর শহরের দিকে রওনা হল। মাইল খানেক যেতে না যেতেই খবর পেয়ে সামরিক অফিসাররা ছুটে এসে রাস্তা আগলে দাড়ালো। তাদের হাতে রাইফেল আর মেশিনগান কিন্তু মরণজয়ী এই সব সৈনিকদের দমিয়ে দেওয়া অত সোজা নয়।

সামনে বিশ গজ এগোতেই একটা বিরাট লরী এসে পড়ল্ এই মিছিলের উপর। সামান্য কজন আহত হলেন। একজনের মাথায় সাংঘাতিক চোট পেল। তবু ওরা আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেল। একটি অফিসার সামনে রিভালবার তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে বীরের মত বুক পেতে দিয়ে একজন সৈনিক বলে উঠলেন "সাহস হয় গুলি কর। দেখি তোমার রিভালবারে কত গুলি আছে।"

কারও পা এতটুকু কাঁপেনি কেউ একটুও ঘাবড়াইনি। প্রত্যেকটী মুখে অবিচলিত প্রতিজ্ঞা : অবরোধ ভাঙ্গবো। পলাশীর লজ্জা রক্তে মুছে দিতে হবে। অফিসার ইতঃস্তত করে সরে পড়ল। শেষে তাদেরই জয় হল। বেলা ১১ টার তিলক ময়দানে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্টদের সাহায্যে এক বিরাট সভা হয়। এই তিন পার্টির একজন করে সভায় বক্তৃতা করলেন। সৈন্যদের মধ্যে থেকে অনেকে বললেন। তারপরই ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ও ধর্ম্মঘট কমিটীও তৈরী হল। বেলা তিনটা সভা শেষ হবার পর সহর বাসীরা চাঁদা তুলে এই সব ধর্ম্মঘটী সৈনিকদের চা ও জলখাবারের আয়োজন করেন।

বিকালে ব্যারাকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের আটক করা হল। ছাউনীর চারিদিকে মেশিনগানের বেড়াজাল। ওদের সায়েস্তা করার জন্যে গোরা সৈন্যের দল জড়ানো হয়েছে। দেশী সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।

তারপরই বন্দী সৈনিকদের উপর বেয়নেট চার্জ্জ করবার হুকুম হলে দেশী সৈন্যরা অমান্য করলে, আলাদা ব্যারাকে ওদের নির্ব্বাসিত করা হল।

পরদিন সকালে কয়েকজন অফিসার এসে বিদ্রোহী নেতাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। তখন সবাই মিলে অফিসারদের ভাগিয়ে দিল। তারপর তারা একদল সশস্ত্র গোরা সৈন্য নিয়ে আবার দুপুরে হানা দিল। ব্যারাকের ভিতরে "আজাদ হোটেলে" ঢুকে কয়েকজনকে তারা গায়ের জোরে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে সৈনিকরা আবার বাধা দেয়। গোরা সৈন্যরা 'কালা আদমীর' উপর এই ঐক্যের পরিচয় পেয়ে ভীষণ ক্ষেপে উঠল এবং পৈশাচিক ভাবে গুলী চালাল। দুইজন সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বিশজন সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম হয়। ঠেলাঠেলির মধ্যে একধারের বেড়া ভেঙ্গে পড়ল একদল বেড়া ডিঙ্গিয়ে শহরের ভেতর ক্ষতবিক্ষত দেহে ছুটে গিয়ে কংগ্রেস লীগ—কমিউনিষ্ট তিনদলের নেতাদেরই খবর দেন। কংগ্রেস আর লীগের নেতারা বললেন, "আত্মসমর্পণ কর"। শুধু জব্বলপুরের এক কমিউনিষ্ট নেতা সৈনিকদের লড়াই সমর্থন করতে উঠেছিলেন। বাকি সবাই তাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন। কংগ্রেস লীগ কমিউনিষ্টদের নিয়ে মিলিত কমিটি গঠন করার কথা হলে কংগ্রেস নেতা তেওয়ারজী বলেন, 'যে যার আলাদাভাবে কাজ করে যাও, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দরকার নাই।' একজন

নাম করা নেতাও গোলমাল দেখে রাতারাতি শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

আগের দিনে মাথা উচু করে ছাউনীতে যারা ফিরেছিল, সেদিন মাথা নীচু করে ব্যারাকে ফিরতে হল। কমিশনারের কাছ থেকে নেতারা সুপারিশ আদায় করেছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ যেন কোন শাস্তি না দেন।

তারপরই ৬ মাইল দূরে বিদ্রোহী সৈনিকদের কয়েদ করা হল। একটা ছোট্ট অন্ধকূপ কুঠরীতে ১৬০ জন বন্দী। সেইখানেই পায়খানা সেখানেই শয্যা—যেন সাক্ষাৎ নরক।

২রা মার্চ্চ বিশেষ বন্দীদিগকে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীরা বন্দী সৈনিকদের কাছে লেখা মওলানা আজাদের চিঠি দেখালেন। আজাদ শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগ দিতে বলেছেন। ৬ই মার্চ্চ রাজী হয়ে সমস্ত বন্দী সৈনিকরা ব্যারাকে ফিরে এল।

ফিরে এসে প্রত্যেকেই ভাবছে সামনে দুর্ভিক্ষ, দেশ জোড়া আর্থিক সঙ্কট—কোন দাবীই ত পূরণ হল না। তবু এইটুকু হল যে, দেশবাসীর কাছে এত দিন পরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী জানিয়ে দিতে পারলো যে তারা চায় স্বাধীনতা, চায় জাতীয় সরকার চায় সৈন্য বাহিনীকে সম্পূর্ণ জাতীয় করণ।

*　　*　　*　　*

কাপ্তেন বুরহানউদ্দীনের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে জব্বলপুরে ভারতীয় সিগন্যাল কোরের এবং ইলেট্রীকাল ও মেকনিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপোর প্রায় ২০০ সৈন্য ২৭শে ফেব্রুয়ারী ধর্ম্মঘট করেন এবং কংগ্রেস্

লীগ, ও কমিউনিষ্ট পতাকা নিয়ে মিছিল করেন। পরে তাঁহারা তিলক ভূমিতে সমবেত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত লোকের মুক্তি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, খাদ্য সঙ্কটের জন্য বিজয়োৎসব বাতিল করে এবং মাহিনা ও রেশন বৃদ্ধি, বাসস্থানের সুব্যবস্থা প্রভৃতির দাবী জানিয়ে বক্তৃতা করেন। সভায় এডমিরাল গডফ্রে ও প্রধান সেনাপতির তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায় কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট নেতারা উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণও বিপুল সংখ্যায় সভায় যোগ দেয়। সৈন্যরা ভেদ বিভেদ তুলে সকলে রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবার জন্য অনুরোধ করেন।

তাঁহাদের অভিযোগে প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অহিংস থেকে ধর্ম্মঘট চালাবার সংকল্প জ্ঞাপন করেন। একজন সৈন্য বলেন দাস হয়ে জন্মেছি বলে দাস হয়ে মরতে চাই না। দেশের জন্য আমাদের শেষ রক্ত কিছু পাত করব। নেতাজীর প্রতিকৃতিকে অভিবাদন জানিয়ে শান্তভাবে ব্যারাকে তাহাদের আটক করে রাখা হয়। সৈন্যরা মিছিল বাহির করবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদাররা হরতাল করেন।

বৃহস্পতিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন প্রায় ৩৭৫জন ভারতীয় সৈন্য হঠাৎ ছুটতে ছুটতে সহরে আসেন এবং তিলকভূমী স্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে

কয়েকঘণ্টা ধরে নানা অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় সিগনাল কোরের সৈন্যরা গোলমালের জন্য দায়ী সৈন্যদের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হইলে উহাদের গ্রেপ্তারের জন্য একদল সৈন্য পাঠান হয়। তখন উহারা কয়েধানার বেড়া ভেঙ্গে ফেলে এবং

প্রায় ১০০জন সহরে চলে আসে। একবারও গুলী চালান হয়নি। পরে সিগনাল কোরের প্রায় ২৫০জন কেরাণী মিলিটারী একাউণ্টস, সৈন্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ধর্ম্মঘট করেন এবং শোভাযাত্রা করে সহর প্রদক্ষিণ করেন। সভায় ধর্ম্মঘটীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না করবার দাবী জানান হয়। নেতারা ধর্ম্মঘটীদের লাইনে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশঙ্কা করে নেতারা কমিশনারের নিকট এ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করেন। উত্তরে তাঁহাদের কমিশনার জানান যে, ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সৈন্যদলের সাধারণ অপরাধীদের অনুরূপ ব্যবহার করা হবে। রাত্রে সৈন্যরা শান্তভাবে ব্যারাকে ফিরে যান।

২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে জব্বলপুরস্থ ভারতীয় সৈন্যদলের কতকাংশ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করায় জব্বপুরের জেলা মেজিষ্ট্রেট ভারত রক্ষা আইনের ১২ধারা অনুসারে সহরের কোন কোন অঞ্চলকে ৭ দিনের জন্য নিষিদ্ধ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই ধর্ম্মঘটের জের হিসাবে ৩য় ব্যাটালিয়নের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জমাদার ভেঙ্কট মুন্নস্বামী নাইডু ও আরও ২৯জনকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় এসেম্বলীর কংগ্রেসীদলের সদস্য শেঠ গোবিন্দ দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে সমর বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ক্যাসল বলেন যে, জব্বলপুর সিগন্যাল কোরের সৈন্যদের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে জনৎসিং, মনগলাল, গোপালসিংহ মহম্মদ হোসেন, জ্ঞানসিংহ, আশীর্ব্বাদম, দামোদরম, মারাম, গোলাম হোসেন, মহম্মদ রসিদ প্রেম নারায়ণ সিংহ, রাজনারায়ণ রায় আলহার রাও, মেজর কৃষ্ণন, উত্তম সিংহ, আবদুল্লা খান, ডি, ডি, মিনু শাকী মহম্মদ, রামন নায়ার ও মুকোদন নায়ারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

দেশবাসীর প্রতি—

ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখা সম্পর্কে শেষ বিবৃতিতে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটি বলেন।

সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করিবার পর আমরা ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিলাম। সর্দ্দারজী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে যাহাতে একটি লোকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না হয়, তাহা কংগ্রেস দেখিবে এবং আমাদের ন্যায্য দাবী মিটাইবার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবে। জিন্নাসাহেবের সহানুভূতিপূর্ণ বিবৃতিতে আমরা নিশ্চিত হইয়াছি যে কংগ্রেস ও লীগ দুই পক্ষেরই সমর্থন আমরা পাইব। তাই ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিলাম। তবু আমরা নৌ বিভাগ ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের সৈন্যও সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে কর্ত্তৃপক্ষ যদি একজনও ধর্ম্মঘটীকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে আমরা আবার ধর্ম্মঘট করিবার জন্য এক বিন্দু ইতস্ততঃ করিব না।

বোম্বের জনগণ বিশেষ করিয়া শ্রমিক ছাত্র ও শহরবাসী গত দুই দিন আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন—তাহার জন্য আমরা তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমাদের উদ্দেশ্যকে ভাল এবং আমাদের দাবীকে ন্যায্য বলিয়া সমগ্র ভারতবাসী গ্রহণ করিয়াছে—তাহা এই সমস্ত কাজ হইতেই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি এবং অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি। নিরপরাধ নরনারীর উপর বৃটিশের সমর শক্তির একান্ত অন্যায় ও পাশবিক

গুলি চালনার ফলে যে শত শত নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন জনগণের সহিত আমরাও তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব যে রক্তস্নাত বোম্বাই নগরীর ভাগ্যে জুটিয়াছে তাহার জন্য ধর্ম্মঘটিদের কেন্দ্রীয় কমিটি সর্ব্বশক্তি দিয়া বৃটিশের সামরিক ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে নিন্দা করিতেছে। আমরা জনগণের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং আপনাদের কাছে আমাদের শেষ ব্যক্তব্য হইল আপনারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন —তাহার জন্য আমরা আনন্দিত, গর্ব্বিত ও কৃতজ্ঞ। যাহারা প্রাণ দিয়েছেন তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। আপনারা হাজারে হাজারে যদি আমাদের পাশে না আসিতেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন না করিতেন তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মঘট রক্তপ্লাবনে ডুবিয়া যাইত।

আমাদের জাতীয় জীবনে ঐ ধর্ম্মঘট এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও ভারতের জনসাধারণের রক্ত একই ধারায় প্রবাহিত হইল। এই অভিজ্ঞতা সৈন্যবাহিনীর কেহ কখনো ভুলিতে পারিবে না এবং আমরা জানি আপনারা, আমাদের ভাইবোনেরাও ইহা কখনো ভুলিতে পারেন না। ভারতের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হউক।

—জয়হিন্দ

বোম্বাই করাচী কলিকাতা ও মান্দ্রাজে নৌ-বাহিনীর ধর্ম্মঘট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিল। বোম্বাইয়ের ১০ হাজার নৌ-সেনা ধর্ম্মঘট করিবার পর বন্দরে সমস্ত জাহাজ দখল করেন, নৌ-সেনাপতি আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিবার ভয় দেখাইলে, তাহার জবাব দেয় এই ১০ হাজার

নৌ-সেনা ; সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পরাজয় মানিয়া লইব না। করাচীতে 'হিন্দুস্থান' জাহাজ দখল করিবার জন্য বৃটিশ সৈন্যরা বিমানপোত হইতে জাহাজে আগুন লাগাইয়া দেয়। নৌ-বাহিনীর ভাইরা কামানের ভয়েও পরাজয় স্বীকার করেন নাই।

হিন্দু মুসলমান সকল মতের নৌ-সেনারা সম্মিলিতভাবে তিন পতাকার তলে নিজেদের জঙ্গী কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটি গঠন করিয়া একযোগে সারা ভারতে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। সংগ্রামের প্রধান দাবী: গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নৌ-সেনা ও সৈন্যদের উপর অবিচার ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ। বেতন, খাদ্য, পোষাক প্রভৃতি সকল ব্যাপারে চিরদিন গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ সৈন্যদের বেশী সুবিধা দিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিয়াছে। কংগ্রেস, লীগ প্রত্যেকটি ভারতীয় দল বারবার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কেহই এই অবিচার মুখ বুজিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় দাবী: ইন্দোনেশিয়া হইতে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরাইয়া আনা হউক। মাত্র অল্প কয়দিন আগেও কংগ্রেস ও লীগ দলের সমর্থনে এই দাবী ভারতীয় আইন পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। ইহা এখন প্রত্যেকটি ভারতবাসীর নিজস্ব দাবীতে পরিণত হইয়াছে। তৃতীয় দাবী: আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি, বোম্বাই, কলিকাতা, লাহোর, দিল্লী ভারতের সর্ব্বত্র যে দাবীর জন্য শত শত দেশভক্ত জীবন কোরবানী করিয়াছেন তাহার জন্য নৌ-বাহিনীই বা লড়িবেন না কেন?

কিন্তু নৌ-বাহিনীর লোকেরা জানিতেন, তাহাদের ধর্ম্মঘটকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ বলিয়া ঘোষণা করিবে। বৃটিশ সৈন্যের বেয়নেট ও মেশিনগান মিশর আর কাইরো, আরব আর প্যালেষ্টাইন,

গ্রীস আর ইন্দোনেশিয়া দুনিয়ার সর্ব্বত্র যে বর্ব্বরতার অভিযান শুরু করিয়াছে, ভারতে তাহারই চরম রূপ ফুটিয়া উঠিবে। তাই সেদিন সমস্ত দেশভক্ত ও জননেতাদের ডাক দিয়া নৌ-বাহিনীর লোকেরা অন্যায় করে নাই। আমাদের এই আবেদনে বোম্বাইয়ের মজুরশ্রেণী যেভাবে সাড়া দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রতিবাদ আন্দোলনে প্রত্যেকটি দেশের সাধারণ লোকের পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় অংশ থাকিলেও নেতাদের বিন্দুমাত্র সহযোগিতা দেখা যায় নাই।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, কংগ্রেস এবং লীগ নেতারা দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে "বিদ্রোহী"দের ধ্বংস করা তাহাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না। কিন্তু বিরাট জনমত এই "বিদ্রোহী"দের পিছনে ছিল বলিয়াই বৃটিশের এই দম্ভ চূর্ণ করিয়াছে। নৌ-বিদ্রোহ কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের বিপ্লবী মনের স্বাভাবিক প্রকাশ। নেতারা ইহা হইতে কি শিক্ষা গ্রহণ করিলেন জানি না, দেশবাসী ইহার মধ্যে রক্তাক্ষরে ভবিষ্যতের লেখাই দেখিতেছেন। সেই লেখার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের কোন অদৃশ্য হস্তের স্থান নাই, মাউণ্টব্যাটেনের উপর ভরসা নাই, আছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযানের ডাক।

দেশব্যাপী ভারতীয় বৈমানিকদের ধর্ম্মঘট

৭ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৩ ইউনিটের অফিসার সহ মোট ৮০০ শত জন লোক বেতন, কর্ম্মচুক্তি, পেনসন ইত্যাদি দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট সুরু করেন। এক মাসের মধ্যে এই ধর্ম্মঘট ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কাণপুর, ইয়েলাহানকা (বাঙ্গালোর), লাহোর ও শেষে করাচী বিমান ঘাটিতেও ধর্ম্মঘট হয়।

বোম্বাই বিমান বাহিনীর ধর্ম্মঘটের প্রধান কারণ অফিসারদের দুর্ব্ব্যবহার।

ম্যারাইন লাইন ব্যারাকে একজন সাধারণ বৈমানিককে তাঁহার অফিসার মারধোর করেন। প্রতিবাদে ৬ শত বৈমানিক ধর্ম্মঘট করিয়া বসেন। দীর্ঘকালের অভিযোগগুলি একে একে দাবীর আকারে দেখা দেয়ঃ প্রথম দাবী—সুখ-সুবিধা, খাবার-দাবার ইত্যাদিতে সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয় দাবী—যুদ্ধ গ্রাচুয়িটি বৃদ্ধির। তৃতীয় দাবীতে বিমান বহর তুলে দিলে পর বৈমানিকদের জন্য কি কাজের বন্দোবস্ত করা হয়েছে তাহার আশ্বাস দিতে হবে।

ভারতীয় বৈমানিকেরা এতদিন কিরূপ জঘন্য অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন এবং তাঁহাদের দাবীগুলি কত ন্যায় সঙ্গত তা এই ধর্ম্ম-ঘটের ব্যাপকতায় প্রকাশ পায়।

বিমান বাহিনীর অবস্থার সঙ্গে যাঁহার সামান্য পরিচয়ও আছে তিনি ভারতীয় বৈমানিকদের এই দাবীগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন।

অনশন ধর্ম্মঘট

বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর উপর গোলাগুলী বর্ষণের গত শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি থেকে ডালহোসী স্কোয়ারের ভারতীয় বিমান বহরের শত শত ভারতীয় সৈনিক অনশন ধর্ম্মঘট করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে আধেঁরী ও মেরিণ ড্রাইভ শিবিরের ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক হাজারের অধিক লোক ভারতীয় নৌ-বাহিনীর শিক্ষার্থীদের ধর্ম্মঘটের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেন। "মেরিণ ড্রাইভ" শিবিরের লোকেরা ধর্ম্মঘট করে শিবিরের মধ্যে আটক থাকতে অস্বীকার করেন। ইহার পর তাঁহাদের উপর লাটি চার্জ্জ করা হয়। পরে আধেরী শিবিরের ৪৫০ জন লোক মেরিণ ড্রাইভে আসেন এবং এই দুই শিবিরের লোক একত্রে এক শোভাযাত্রা বের করেন।

শোভাযাত্রীরা জোর গলায় বৃটিশ বিরোধী ও সামরিক পুলিশের লাঠি চার্জ্জের প্রতিবাদ ধ্বনি করতে করতে অগ্রসর হন।

পাতিয়ালার ল্যান্সারদের বিদ্রোহ

২৩শে আগষ্ট ১৯৪৬। পাতিয়ালার জনসাধারণ এক অদ্ভুত পূর্ব্ব দৃশ্য দেখালো। ৫০০ বল্লমধারী সৈন্য পূর্ণ সামরিক পোষাক প'রে তেরঙ্গা, সবুজ আর লালঝাণ্ডা হাতে ক'রে ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, আমরা আপনারা ভাই ভাই আর সামরিক বন্দীদের মুক্তি চাই ধ্বনি করতে করতে রাস্তা দিয়ে মার্চ ক'রে চলেছে।

যুদ্ধ রত প্রথম পাতিয়ালা ল্যাসর্সের বীর সৈন্যদল তাদের উদ্যম্ দমন করার ষড়যন্ত্র এবং তাদের নেতাদের সাজা দেওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বিদেশে গৌরবময় কার্য্যকলাপের পর তাঁরা মাত্র গত মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। যেদিন তারা বোম্বাই সহরে পৌছাল সেই দিন থেকেই তাঁদের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। জাহাজ থেকে নামবার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ খুব ভালো করে তাঁদের দেহ তল্লাসীর হুকুম জারি করলেন। ইউরোপে আর মধ্য-প্রাচ্যে তাঁরা জনসাধারণের স্বাধীনতার নূতন আন্দোলন দেখেছিলেন তাঁদের নিজেদের মনেও নূতন চেতনা জেগে উঠেছে। তাঁরা এই অপমানজনক হুকুমের বিরোধিতা করেন এবং কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। যখন তাঁরা পাতিয়ালা পৌছিলেন তখন কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্যদলকে বশে আনার জন্য আর এক চাল খেললেন। সবাইকে ছুটি দেওয়া হল। অপর একটি রেজিমেন্ট ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে অস্বীকার করেছিল। তাদেরকেও পাতিয়ালায় ফিরিয়ে এনে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাজ্যের কর্তৃপক্ষের মতলব ছিল যে সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে সেই অবসরে তাদের নেতাদের শাস্তি বিধান করা। প্রথম পাতিয়ালা ল্যানসার্সের সৈন্যরা যখন ছুটি শেষে ফিরে এলেন তখন দেখেন যে তাঁদের নেতা রাম সিং, হরনায়ক সিং মনন সিং আর গুরুদেব সিংকে বন্দী করা হ'য়েছে। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধি দল নিয়ে গেলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদলের নেতা প্রীতম সিং আর গুরুজনকে গ্রেপ্তার করলেন।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সৈন্যরা প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়ে মিছিল বের করলেন। এবং ব্যারাকে ফিরে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের

সহকর্মীদের হাজৎ থেকে মুক্তি করলেন। কেউ বাধা দিতে সাহস করল না। এরপর প্রথম পরিচালনা ল্যান্সসের বীর বিদ্রোহী সৈন্যদের মধ্যে ৬০জন আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। মহারাজার শিকারী গোয়েন্দাদের সমস্ত কল কৌশল ব্যর্থ করে তাঁহারা গ্রামের পর গ্রামের দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করেন। ফেরারী নেতাদের মধ্যে ধরা পড়লেন মাত্র ৩জন—মোহর চাঁদ, হাসাম মহম্মদ এবং অর্জ্জুন সিং।

প্রত্যেক ফেরারী নেতার বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হল। পাতিয়ালা আর্মি ইউনিয়নের সভাপতি যোগেন্দ্র সিংয়ের নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল। গত আগষ্ট মাসে ইহারই নেতৃত্বে মহারাজার প্রাসাদের সম্মুখে সৈন্যরা অনশন ধর্ম্মঘট করেন। অনশনের সময় মহারাজা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, সৈন্যরা কাজে যোগ দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রাহ্য করা হবে না। এই প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে ৩০জন ল্যান্সেসার এবং ১৫জন ওয়ারলেস অপারেটর কাজে ফিরে যান। কিন্তু কাজে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই তাঁহাদের মধ্যে শতাধিক লোককে বরখাস্ত করা হয় এবং আরও ১০০জনকে বাহাদুরগড় দুর্গে অন্তরীন করে রাখা হয়। এই ঘটনার পর পাতিয়ালি আমি ইউনিয়নের সভাপতি যোগেন্দ্র সিং ল্যানমাসের পিছনে গণসমর্থন লাভের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

* প্রজামণ্ডলের নেতারা উত্তর দিয়েছেন, এখন তাঁহারা কোনো "বিক্ষোভ" পছন্দ করেন না।

* মুসলিমলীগ কর্ত্তৃপক্ষ বলেছেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মহারাজার বিরুদ্ধে নয়।

* আকালী নেতারা একজন শিখ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

হতাশ হয়ে যোগেন্দ্র সিং নয়াদিল্লীতে মধ্যকালীন গভর্ণমেণ্টের নেতাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন।

২৫ শে অক্টোবর তিনি সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করেন। সর্দ্দার প্যাটেল উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দেন", "কংগ্রেসের সাহায্য পাবার কি অধিকার তোমাদের আছে? আন্দোলন আরম্ভ করার সময় তোমরা কমিউনিষ্টদের কাছে গেছিলে এখনও আবার তাদের কাছে যাওনা কেন?" এই বলেই তিনি যোগেন্দ্র সিংকে ঘর হতে বের হয়ে যেতে বলেন।

২৫শে অক্টোবর তিনি দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেও বলে পাঠান "কি, এতবড় ধৃষ্টতা! একজন শিখ মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা। এ রকম লোকের মুখদর্শনও আমি করি না, ওদের সব কটাকেই জেলে পাঠান উচিত।

১লা নভেম্বর যোগেন্দ্র সিং পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহার বড় আশা ছিল অন্ততঃ পণ্ডিত নেহেরু তাঁহাকে হতাশ করবেন না। কিন্তু পণ্ডিতজী তাঁহার চাপরাশীর মারফত বলে পাঠান যে, এখন তাঁহার সময় নেই।

একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবার জন্য যোগেন্দ্র সিং আজাদ্ হিন্দ ফৌজের হেড্ কোয়াটার্সে যান। নেতারা যাই করুন না করুন আজাদ্ হিন্দ ফৌজের বীর কর্ম্মীরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে এই সংগ্রামে সাহায্য করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিস সম্পাদক বললেন, 'আমাদের এত নিয়ে যখন আপনারা অনশন করেন নাই তখন কি করে আপনাদের আমরা সাহায্য করতে পারি?"

যোগেন্দ্র সিংয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ তখন ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি চীৎকার করে উঠে বললেন, "বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়বার সময় আপনারা কি কংগ্রেসের এবং দেশের মত নিয়েছিলেন? তবু তো দেশ আপনাদের সমর্থন জানিয়েছে। আজ আমরা যখন অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই স্থরু করেছি, কেন আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন না?" অফিস সম্পাদক তখন দুঃখ প্রকাশ করে বলেন। "আমাদের অফিস আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য। মহারাজাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য নয়।"

নেতাদের নিকট ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যোগেন্দ্র সিং লাহোরে ফিরে আসেন এবং এক বিবৃতিকে বলেন, "নেতারা হয় ত আমাদের সাহায্য করবেন না; কিন্তু জনগণের উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। এই জনগণই নেতাদের এবং বিভিন্ন সংগঠনকে এতবড় করেছে। সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত লড়বে।"

যোগেন্দ্র সিংয়ের আশা ব্যর্থ হয় নি। পাতিয়ালার জনগণ বীর সৈনিকদের পরিত্যাগ করে নি। তাই প্রায় ৬০ জন ফেরারী নেতা পুলিশের হাজার বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে দূর হতে দূরান্তরে সংগ্রামের বাণী বহন করে চলেছেন।

১৫১৯নং কোম্পানীর সৈন্যদের বিদ্রোহ

১৯৪৬। ফেব্রুয়ারী। এক বছর হ'ল লড়াই থেমে গিয়েছে। কিন্তু মাঝের হাটে কোম্পানীর আস্তানায় কাজ থামে নি। সামরিক পোষাক আর কুচকাওয়াজের প্রাত্যহিক মহড়া—লৌহ কঠিন রুটিনের একবিন্দু নড়চড় নেই।

কিন্তু সিপাইদের অসন্তোষ এই রুটিন বন্ধ করতে পারে নি। ইট-বালি মিশানো পচা চাল-আটার রেশন। কম মাইনে তাও সরকারী খাজাঞ্চীখানায় তার এক অংশ কেটে রাখা হয়—ইহাতে সিপাহীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। আলাপ আলোচনা, বৈঠক-জমায়েত ঠিক হ'ল—"আমরা এর প্রতিকার চাই। মানুষের মত বাঁচিবার জন্য চাই বিদ্রোহ।" বেশীর ভাগ সিপাহী নিম্ন মধ্যবিত্ত ও চাষী পরিবারের ছেলে। বুক ফুলাইয়া তাঁহারা বললেন—"থামব না।"

২৪শে ফেব্রুয়ারী। বিকালে প্যারেডে সমস্ত কোম্পানী সার বেধে দাঁড়িয়েছে। অফিসার কমাণ্ডিং আসিলে সকলে এক বাক্যে জানাল "আমাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার না হ'লে আমরা প্যারেড করব না, আমরা বিদ্রোহ করলাম।" ক্যাপ্টেন গ্রিফিথস্ হতভম্ব। "ব্লাকী নেটিভের" এত স্পর্দ্ধা। অনেক ভয়-ভীতি দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের নেতা কে?" ২২ বছরের ল্যান্স নায়ক (এন্-সি-ও) বুধন সাহেব এগিয়ে আসলেন। হুকুম হ'ল—"তোমরা কোয়াটার গার্ডদের রাইফেল এমিউনিশন ও কিট্ ফিরিয়ে দাও।"

জবাব হ'ল—"দেব না।" গ্রিফিথস্ সাহেবের আর সহ্য হ'ল না। বুধনের গায়ে হাত তুলিলেন। কিন্তু "কালা চামড়া"র কর্কশ হাতের জবাব পেলেন তিনি। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। টেলিফোনে এই বিদ্রোহের খবর গেল কলিকাতার এরিয়া কম্যাণ্ডারের নিকট। বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা করবার জন্য পাঞ্জাবী আর গাড়োয়ালী সৈন্যদের উপর আদেশ হ'ল। কিন্তু পাঞ্জাবী গাড়োয়ালীরা ভারতীয় ভাইদের 'ঠাণ্ডা' করতে রাজী নয়। ব্যারাকের চারিদিকে পাহারা বসল। রাত্রী দেড়টা। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী আর গোরা সৈন্য

ভর্ত্তি ট্রাক নিয়ে এরিয়া কমাণ্ডার বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে আসলেন।

"থাম!"—গেটের ১৫ গজ দূরে আসতেই হুকুম আসল—বুধন সাহেবের আদেশ।

এরিয়া কমাণ্ডার বিস্ময়ে হতবাক। শান্ত্রীরা জানাল—"ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকিবার আদেশ নাই।" বড় বড় কর্ত্তারা দৌড়ে আস্‌লেন। তাঁহারা বুধন সাহেবকে আদেশ দিলেন—"এরিয়া কম্যাণ্ডারকে ঢুকতে দাও। বুধন সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তে অটল।

তারপর ট্যাঙ্ক, সাজোয়া গাড়ী আর গোরা সৈন্যের হাতে এই বীর বিদ্রোহীদের পরাজয় আর এক বিপ্লবের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। কোর্টমার্শালে বুধন সাহেবকে মাফ চাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ঘৃণায় বুধন সাহেব তাহা প্রত্যাখ্যান করেন—"শত্রুর কাছে মাফ চাইব না"। তাঁহার সাজা হয়েছিল সবচেয়ে বেশী।

১৯৪৪ সালের একটী অজ্ঞাত বিদ্রোহের কাহিনী

১৯৪৪ সাল। ১৯৪ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেইনটেনান্স কোম্পানীর প্রায় ৪শত সৈন্যকে ব্রহ্ম সীমান্তের অতি প্রয়োজনীয় রেলপথ রক্ষা করার জন্য ডিমাপুরে রাখা হয়েছে। কোম্পানীর নূতন কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর পামার নূতন এসেছেন। কিন্তু এসেই তিনি সাধারণ সৈনিকরা যে সব সুবিধা ভোগ করত একে একে সব বাতিল করতে লাগলেন। কোম্পানীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। সিপাহীরা সাধারণত বড় অফিসারদের কাছে ঘেষতে পারেন না। তাই তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় এন-সি-ও হাবিলদার মেজর খানের নিকট তাঁহাদের অভিযোগ জানান। হাবিলদার মেজর খান ইহার পূর্ব্বে অনেকবার মেজর পামারের অত্যাচারের প্রতিবাদে জানিয়েছেন। তিনি কোম্পানীর দুইজন 'ডি-সি-ও' জমাদার ও সুবাদারের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা তিনজনে মিলে ভারতীয় সিপাহীদের পক্ষ হ'তে মেজর পামারের নিকট দরবার করতে যাবেন। কিন্তু জমাদার ও সুবেদার হাবিলদার মেজর খানকে তাঁহার ঔদ্ধত্যের জন্য ভর্ৎসনা করে ভাগিয়ে দেন। তখন হাবিলদার মেজর খান নিজের দায়িত্বে সিপাহীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মকুব করতে আরম্ভ করেন। মেজর পামার একথা জানতে পেরে খানকে ডেকে তাঁহাকে শাস্তির ভয় দেখান এবং বলেন, "ভারতীয় সৈন্যদের সব সময় বুটের তলায় রাখতে হবে, নতুবা তাহারা মাথায় উঠে বসবে।" ইহার পর মেজর পামার ও তাঁহার তাঁবেদার জমাদার ও সুবাদার সাহেবের সঙ্গে খানের বিরোধ ক্রমশই বাড়তে লাগল।

অবশেষে মেজর পামার স্বয়ং একদিন রোলকলে উপস্থিত হয়ে সকলের সামনে হাবিলদার মেজর খানকে পদচ্যুত করিলেন। মেজর সাহেব নিজে খানের হাত হতে 'ক্রাউন' খুলে ফেললেন এবং সকলের সঙ্গে 'ফল্ ইন্' করবার আদেশ দিলেন। পরদিন খানের উপর বদ্‌লীর হুকুম এল। বিছনাপত্র ঘাড়ে করে খান স্টেশনে চলে গেলেন—কর্ত্তাদের হুকুমে ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ সঙ্গে যেতে পারল না।

পরদিন সকাল হ'তেই সমস্ত ব্যারাকে থমথমে ভাব। সিপাহীদের মনে অসহিষ্ণু বিদ্রোহের আগুন। সকালের প্রাত্যহিক প্যারেডের পর যে যার ব্যারাকে চলে গেছে। এমন সময় মেজর হাবিলদার খান ধীরে ধীরে ব্যারাকে ঢুকলেন। সিপাহীদের এই অতি প্রিয় হাবিলদারকে প্রহরীরা চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পায় নি। কোয়ার্টারে আস্তে ঢুকে খান সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করলেন। সকলের মনে স্তব্ধতার মেঘ কেটে গেল। গার্ড কমাণ্ডারের হাতে ১০টি লাইভ রাউণ্ড লোড্ করা স্টেনগান। খান সেটি নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচোড়া করলেন। তারপর সকলকে হতভম্ব করে হঠাৎ এক দৌড়ে অফিসারদের মেসের দিকে চলে গেলেন। গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম! সকলে কিছু বুঝবার আগেই তিনটি গুলির আওয়াজ হল। গুলির শব্দে জমাদার ও সুবাদার সাহেব দৌড়ে আসছিলেন; কিন্তু বেশী দূরে যাবার আগেই খানের গুলিতে তাঁহারা মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সমস্ত ব্যারাকের সিপাহীরা এসে জড় হল। প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাবিলদার খান ঘোষণা করলেন,—

মেরে প্যারে ভাইয়ো। দো—চারসে কুছ্ নহি হো সক্‌তা।" তারপর আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন—"যোঁহা পর থাকেভি

ম্যয় ইসি দুসমানকা বদলা লেউঙ্গা।" মেজর হাবিলদার খান তাঁহার কণ্ঠনালীতে স্টেনগানের কালো নল চেপে ধরে টি্গার টিপ্‌লেন। পরদিন সকালে সশস্ত্র এম-পি এসে ব্যারাক ঘিরল। কোণে কোণে আর গেটে গেটে ব্রেণগানের পাহারা। মেজর পাসার আর সুবাদার ও জমাদার সাহেবের ঘৃণ্য মৃতদেহ এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেল। মেজর হাবিলদার খানের দেহ পড়ে র'ল। ঝড় জাল, বৃষ্টির মধ্যে তাহা বিকৃত হ'য়ে উঠতে লাগল। কিন্তু জীবনের বিনিময়ে মেজর খান যে আহ্বান জানালেন, তাহা বিকৃত হয় নি। দিকে দিকে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে আজ তার নূতন নূতন আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কোহাট বিমানঘাটিতে ধর্ম্মঘট

[গত ১৭ই মে ১৯৪৬ কোহাট আর, এ, এফ ষ্টেশনের ভারতীয় এবার-ম্যানদের এক বিরাট ধর্ম্মঘট হয়। জনৈক সৈনিকের নিম্নলিখিত পত্রে ধর্ম্মঘটের কারণ ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অবাধ অত্যাচারের প্রকৃত বিবরণ মিলবে।]

১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৬। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দিনে জীবিকার আর কোন উপায় না দেখে আমরা সামরিক চাকুরিতে ঢুকি। অবশ্য সেদিন চটক লাগানো বিজ্ঞাপন আর মনোরঞ্জক ছবি আমাদের আকৃষ্ট করেছিল খুবই। আজ নানা রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গড়পড়তায় আমাদের প্রত্যেকেরই ৪।৫ বৎসর কেটে গিয়েছে। আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা কি? অন্যান্য নন্‌-টেকনিসিয়ানদের কথা ছেড়ে দিয়ে আর, এ, এফ টেকনিসিয়ানদের কথাই ধরি। আমাদের বেতন গড়ে ৬০৲ টাকা। আমাদের সকলেরই মাথার উপর বিরাট পারিবার। বর্ত্তমান বাজার দর সম্বন্ধে সচেতন যে কোন লোক স্বীকার করবেন যে এই বেতনে কিছুই হয় না। উপরন্তু এই ৬০৲ টাকা থেকে মেসিং, স্পোর্ট, ব্যারাক, ড্যামেজ ইত্যাদির জন্য ৪॥০-৫৲ টাকা দিতে হয়; তারপর যে সব বিশ্রী পোষাক দেওয়া হয়, তা পরার উপযোগী করে নিতেও মাসে ৫৲-৬৲ টাকা লাগে, অথচ এসব আমাদের বিনা পয়সাই পাবার কথা। অনেকেরই ২।৩ বছর আগে ৬০৲ টাকা বেতন ছিল, আজও তাই আছে, যুদ্ধ থেকে গিয়েছে. তবুও আজকাল প্রত্যহ আমাদের গড়ে ১০॥ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। নিয়মিত কাজের সময় এরোপ্লেন মেরামতের কাজ

ছাড়াও আমাদের বিনা পারিশ্রমিকে যে সব কাজ করতে হয়, তা লিখতেও লজ্জা হয়। কুলীরাও মাল টেনে বা বয়ে দিনে ৬৲-৭৲ টাকা উপার্জ্জন করে। আর আমাদের যে যার কাজ ছাড়াও গলদঘর্ম্ম হয়ে বড় বড় 'হাঙ্গারের দরজা খোলা, রোজ ১০-১২ খানা এরোপ্লেন ঠেলে বের করে নিয়ে যাওয়া, এরোপ্লেন ধুয়ে পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ করতে হয়।

তারপর গড়ে সবাইকে ১৫ দিনে একদিন সারারাত্রি জেগে গার্ড ডিউটি দিতে হবে, সপ্তাহ অন্তর সকাল ৬॥ থেকে সন্ধ্যা ৭॥টা প্র্যন্ত রৌদ্রের মধ্যে থেকে এরোপ্লেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশুনা করতে হবে এবং 'মুভমেণ্টের সময় ওয়াগলের পর ওয়াগল বাছাই ও খালি করতে হবে। তারপর অবসর সময়ে হুকুম হলেই কাজে যেতে হবে। তা দিনই হোক বা রাত্রিই হোক, শনিবারই হোক বা রবিবারেই হোক। প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম পাওয়া যায় না। বছরের পর বছর একই ভাবে চলেছে। যা খাবার দেওয়া হয় 'তা'তে পেট ভ'রে খাওয়া চলে না। যে জঘন্য খাবার দেওয়া হয়, যেন কোন বেসামরিক লোককে তা' ৭ দিনেই অতিষ্ট করে তুলবে। অথচ অপচয়ের সীমা নেই। যে পোষাক আমাদের দেওয়া হয় তার কোন প্যাণ্টে হয়ত দু'জনকে ভর রাখা যায়। গেঞ্জীতে হয়ত একই সাথে তিনটি মাথা ঢুকে যায়।

ছুটির সময় ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতেই ছুটি ফুরিয়ে যায়। কর্ত্তৃপক্ষের দূরত্ব সম্বন্ধে কোন বিবেচনা নাই।

অপদার্থ অফিসারদের প্রতিবাদে সালাম ঠুকতে হবে। তখন কারো জামায় যদি বোতাম না থাকে বা গলা বেশী খোলা

থাকে, তাহ'লে ৭।৮ দিন 'আটকে'র সাজা মিলবে। যারা বিয়ে করেছেন তাদের পরিবার নিয়ে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার সময় কর্তৃপক্ষের কোন নজর থাকে না তাঁদের ওপর। সব কিছুই চরমে উঠল যেদিন আমাদের স্কোয়াড্রেন লীডার হাসানকে অপমান করা হয়। তিনি একজন বৃটিশ এয়্যারম্যানকে অভিযুক্ত করেন, কিন্তু সেই এয়্যার-ম্যানকে ষ্টেশন এ্যাডজুট্যাণ্ট নির্দ্দোষ ব'লে ছেড়ে দেন, অথচ অনুরূপ একটি অভিযোগের দরুণ একজন ভারতীয় এয়ারম্যানকে ২৮ দিনের 'সেল' দেওয়া হয়। বর্ণভেদের অপমানে আমরা গোটা-ষ্টেশনের ভারতীয় এয়ারম্যানরা ধর্ম্মঘট করি। ষ্টেশন্ কমাণ্ডার যখন আমাদের ভরসা দেন যে একটা সুরাহা করা হবে তখন আমরা কাজে যোগদান করি। কিন্তু সুরাহা কিছুই হয় নাই। উপরন্তু ফ্লাইট সার্জ্জেণ্ট বোস, সার্জ্জেণ্ট সেন ও ওয়ারেণ্ট অফিসার কস্তুরীলাল প্রত্যেকের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ফ্লাইট সার্জ্জেণ্ট ভাদুড়ী ও ওয়ারেণ্ট অফিসার দাসগুপ্তের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এরা নাকি ধর্ম্মঘটের জন্য সবাইকে উত্তেজিত ক'রেছেন। এখানে কোহাট আর, এ, এফ ষ্টেশনের অধিপতি হচ্ছেন উইং কমাণ্ডার মেহের সিং। আমরা কার কাছ থেকে এর সত্যিকার বিচারের আশা ক'রব? অন্তর্ব্বর্ত্তী "জাতীয়" সরকারের কাছে না জনসাধারণের কাছে?

ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বৃটিশ নীতি

"এ রকম অপমানজনক সর্তে আমরা আত্মসমর্পণ করি। সাম্রাজ্য-বাদী শাসকদের পদতলে লুটিয়ে পড়ি কোন ভারতবাসীই আমাদের কাছে তা প্রত্যাশা করেন না। আমরা রক্তচক্ষুর ভয়ে আত্মসমর্পণ করব না……

আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সমর্থন করবেন……

"ভাই-বোনেরা! আমাদের আবেদনে সাড়া দিন। আমরা আপনাদের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আছি।"

[বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় নৌ-ধর্মঘটী কমিটির ইস্তাহার—
ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬]

এই ডাক ভারতের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মৃত্যু-পরোয়ানা। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই মাদ্রাজ, আম্বালা, জব্বলপুরে বিমান ও স্থল বাহিনীর ধর্মঘট এই কথাই ঘোষণা করেছে যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের পরে ইতিহাসের চাকা পুরো এক চক্কর ঘুরে এসেছে।

১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহ দমনের পরে "সামরিক আইন জারী হল……(শেতাঙ্গ) সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীরা রক্তাক্ত বিচার স্বরু করলেন, অথবা কোন রকম বিচার না করেই এমন কি স্ত্রীলোক অথবা শিশুদেরও রেহাই না দিয়ে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে গেলেন। পরে রক্তের তৃষ্ণা আরও প্রবল হয়ে উঠল। বৃটিশ পার্লামেন্টের দলিলপত্রে এবং সপরিষদ ভারতের বড়লাটের কাছ থেকে যে সব চিঠি-পত্র বিলাতে এসেছে, তাতেই লেখা আছে যে, "বৃদ্ধ স্ত্রীলোক

ও শিশুদেরও বলি দেওয়া হ'য়েছে; তবে সরাসরি ফাঁসি না দিয়ে গাঁ শুদ্ধ জালিয়ে মারা হ'য়ে থাকবে।”

একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর পৃষ্ঠপোষিত একটি কেতাবে লেখা হয়েছে যে, তিনমাস ধ'রে রোজ স্থর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত অবধি (কোন এক শহরে) আটটা মড়া-টানা গাড়ী লাশ টেনে বেড়িয়েছে—

চৌরাস্তা আর বাহার থেকে।...“(ইংরেজ ঐতিহাসিক কে লিখিত 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' ২য় খণ্ড) সিপাহীবিদ্রোহ দমনের পরে দেশ জুড়ে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদী পরপশুরা ভেবেছিল যে, ভারতবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রেই তারা প্রতিরোধস্পৃহাকে চিরদিনের মত দমিয়ে রাখতে পারবে।

কিন্তু একটা কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জানা ছিল সিপাহী-বিদ্রোহের আগে থেকেই: ভারতবাসীর মনে তাদের কোন ঠাঁই নেই, বুলেট ও বেয়নেটের জোরেই ভারতের মাটিতে ঠাঁই বজায় রাখতে হবে। ঐতিহাসিক কে-সাহেব বিদ্রোহের পূর্বেকার অন্যতম বড়লাট স্যার চার্লস মেটকাফের যে চিঠিপত্র প্রকাশ ক'রেছেন তাতে বারবার এই কথাই বলা হয়েছে যে, “ভারতে আমাদের সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠতর নামরিক শক্তির জোরে। এর স্থায়িত্বও সেই একই ভিত্তির উপর নির্ভর করে। এই ভিৎ যদি এতটুকুও ন'ড়ে ওঠে, তবে গোটা প্রাসাদটাই টলমল করবে।... আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইউরোপীয় দেশের মধ্যে একটাও সুদূর ঘাঁটী ছাড়াই এতবড় একটা সাম্রাজ্য শাসন করছি।......আমাদের প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের মনোভাব সুপ্ত হলেও বদ্ধমূল হয়ে আছে।...

আমাদের রাজত্ব বজায় রাখতে হ'লে বিরাট সামরিক শক্তির প্রয়োজন। এবং যথেষ্ট সংখ্যক বৃটিশ ফৌজ না রাখলে নেটিভ ফৌজের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।" সুতরাং নির্ব্বিবাদে হত্যা ক'রে আর গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার সঙ্গে সঙ্গে ঝানু সাম্রাজ্যবাদীদের শয়তানী মগজ 'নিশ্চিন্ত' হবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা খুঁজতে লাগল।

সিপাহীবিদ্রোহের আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী তিনভাগে ছিল: 'বেঙ্গল', 'বোম্বে' ও 'মাদ্রাস্' আর্মি। এই তিনটী বাহিনীরই সৈন্য সংগ্রহ হ'ত—যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে। এর বাইরে, একমাত্র 'বেঙ্গল আর্মি'তেই সামান্য কিছু পাঞ্জাবী ভর্তি করা হ'ত; কিন্তু সে সম্বন্ধে কড়া নির্দেশ ছিল যে, "কোন রেজিমেণ্টেই পাঞ্জাবীর সংখ্যা দু'শোর বেশী থাকবে না এবং তার মধ্যে আবার একশো জনের বেশী শিখ থাকতে পারবে না।" দশ বছরও হয়নি পাঞ্জাব পদানত হয়েছে—তাই বৃটিশ তখন পাঞ্জাবীদের সন্দেহের চোখে দেখত। 'বেঙ্গল আর্মির' সাহায্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র উত্তর ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেছিল। নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় অযোধ্যাই ছিল বৃটিশের ঘাঁটি এবং অযোধ্যার নবাব এই যুদ্ধ চালাবার জন্য লর্ড হেষ্টিংসকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। পরাধীনতার প্রথম চাবুক খেয়ে পাঞ্জাবী ও গুর্খারা তখন ছটফট করছিল। 'বেঙ্গল আর্মি' বিদ্রোহ করলে বৃটিশ ধুরন্ধররা কৌশলে পাঞ্জাবী ও গুর্খা গাড়োয়ালী প্রভৃতি পাহাড়ীদের জাতক্রোধ জাগিয়ে এবং ঐশ্বর্যশালী দিল্লী আগ্রায় অবাধ লুঠতরাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের 'বেঙ্গল আর্মির' বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে সক্ষম হ'ল। তখনকার

চীফ-অফ-স্টাফ জেনারেল ম্যানস্‌ফিল্ড পরে খুব সরলভাবেই (!) স্বীকার করেছেন যে, শিখরা এই সুযোগে স্বাধীনতার জন্যে আবার লড়াইতে না নেমে আমাদের পতাকাতলে জড় হয়েছিল—তার কারণ এই নয় যে, তারা আমাদের ভাল বলত তার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তারা হিন্দুস্থান ও 'বেঙ্গল আর্মি'কে ঘৃণা করত। তারা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, আর চেয়েছিল হিন্দুস্থানী শহরগুলি লুঠ ক'রে ধনী হতে।" বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে গুর্খা ও শিখদের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের "এই যে সম্পর্ক গড়ে উঠল তা কার্যত অনেকদিন স্থায়ী হ'ল।"

জেনারেল ম্যানস্‌ফিল্ডের ভাষায়, "বিদ্রোহের সময় গুর্খা ও শিখরা যে উপকার করেছিল, তা আমরা ভুলে যাইনি এবং তখন থেকেই ভারতীয় (!) বাহিনীতে সম্মানের আসন পাঞ্জাব ও নেপালের পাওনা হয়ে আছে।" সেনাপতি সাহেবের এ-কথা যে মিথ্যা নয় তা নিচের ছক্ থেকেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হবে।

ভারতীয় বাহিনীতে বিভিন্ন প্রদেশের সংখ্যানুপাত

সাল	পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি	নেপাল গাড়োয়াল প্রভৃতি	ভারতের বাকী অংশ
১৮৫৬ (বিদ্রোহের আগে)	শতকরা দশজনের কর	দু-একজন	৬০%
১৮৫৮ (বিদ্রোহের পরে)	৪৭%	৬%	৪৭%
১৯৩০	৫৯%	২১%	২০%

[ডাঃ আম্বেদকরের পাকিস্থান গ্রন্থ থেকে]

প্রকৃতপক্ষে বৃটিশরাজের প্রতি 'বিশ্বস্থ থাকার সম্ভাবনাকে মাপকাঠি ক'রে উত্তর ভারতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্বের এই নীতি রচিত হলেও, পরবর্ত্তিকালে লর্ড কিচেনর প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধররা এর সমর্থনে এক নতুন যুক্তি চালু করলেন: একমাত্র পাঞ্জাবী পাঠান, গুর্খা ও গাড়োয়ালী প্রভৃতি উত্তর ভারতের অধিবাসীরাই 'বীরপুরুষ' (মার্শাল রেস')।

ভারতবাসীর অন্যান্য অংশ 'কাপুরুষ' (নন্‌-মার্শাল)—শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের এই বুলি আইড়িয়ে স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁর মত 'দেশভক্ত' পাঞ্জাবী গর্ব্ব করে বলেছেন যে, "সৈন্যবাহিনীতে পাঞ্জাবের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হোক। কোন স্বদেশপ্রেমিক পাঞ্জাবীই তা কামনা করেন না।" (হিন্দুস্থান টাইমস, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

এই নতুন চালে সাম্রাজ্যবাদীরা এক ঢিলে দুই পাখি মারবার প্রয়াস পেয়েছিল: একদিকে 'কাপুরুষ' দুর্নাম দিয়ে বাঙ্গালী, মারাঠা ও তামিল প্রভৃতি রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর (এবং সেই কারণেই তাদের অবাঞ্ছনীয়) জনসমষ্টিকে সশস্ত্র বাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

'বীরপুরুষ ও কাপুরুষ' এই দুইভাগে বিভক্ত ক'রেও সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি—'বীরপুরুষ' অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও যাহাতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব জেগে থাকে, তার সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সিপাহীবিদ্রোহের পরেই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান ক'রে ভবিষ্যতে তা ঠেকাবার রাস্তা বাতলাবার জন্যে 'পীল কমিশন' এবং 'স্পেশাল আর্মি কমিটি' নামে দুটি বিশেষজ্ঞ দল বিলাতে থেকে ভারতে চালান দেওয়া হয়।

দীর্ঘকাল অনুসন্ধান পর 'পীল কমিশন' দেখতে পান যে, 'বেঙ্গল আর্মি'তে সুখে দুঃখে সকলে মিলেমিশে থাকত। শ্রেণী বা গোষ্ঠি হিসাবে আলাদা কোম্পানীতে ভাগ ক'রে রাখবার ব্যবস্থা ছিল না……শিবিরের হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও পূর্ব্বিয়া (অযোধ্যার ব্রাহ্মণ) সব একসঙ্গে থাকত; ফলে তাদের জাতিগত বাদবিচার অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল এবং সকলেই এক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।" (ম্যাকমুন ও লোডেটের 'দি আর্মিজ ইন ইণ্ডিয়া')

এর প্রতিবিধানের জন্যে 'পীল কমিশন' শ্রেণীগত সংগঠনের নীতি" (দি পিন্‌সিপ্‌ল অব ক্লাস কম্পোজিশন) সুপারিশ করেন। এই নীতি ব্যাখ্যা ক'রে সেকালকার পাঞ্জাবের শাসনকর্তা স্যার জন লরেন্স বলেন, "শ্রেণী বা জাতিগত পার্থক্য খুব মূল্যবান, এটা বজায় রাখতে হবে; এর ফলে এক অঞ্চলের মুসলমান আরেক অঞ্চলের মুসলমানকে ভয় করবে বা ঘৃণা করবে। এর পরে সৈন্য-দলকে প্রাদেশিক ভিত্তিতে গ'ড়ে তুলতে হবে এবং যেসব অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ বা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাবে। সেই বিভেদ বজায় রেখে সেই অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে।……… এই নীতি চললে বিপদ এড়ানো যাবে: সমগ্র দেশীয় বাহিনীর মধ্যে একাত্মবোধ এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে মেলামেশার ফলে যা দেখা দেয়, সেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও চক্রান্ত।" এই নীতিরই আরেক দিক ব্যাখ্যা করেছেন লর্ড কিচেনারের জীবনীকার স্যার জর্জ আর্থার: "যাতে ভারতীয় বাহিনীতে কোন একটি অংশ আধিপত্য করতে না পারে। সিপাহী বিদ্রোহের শিক্ষার কথা মনে ক'রে গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে সচেতন আছেন। পাঞ্জাবী রেজি-মেণ্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেই তার অবশ্যম্ভাবী পরিপূরক হিসাবে

গুর্খা এবং সীমান্তবাসী পাঠান ভর্তি করা হয়ে থাকে।" (লর্ড কিচেনারের জীবনী ২য় খণ্ড)।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে চিরস্থায়ী বিভেদ, বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কুটিল চক্রান্ত ক'রে রেখেও সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধররা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি। তারা জানত যে, সকল রকমের বাধাবিঘ্ন চূর্ণ ক'রে পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা একদিন সকলকে মিলাবেই (যেমন ক'রে সত্যি সত্যিই রাজকীয় ভারতীয় নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর যোদ্ধারা একদিন মিলেছিল বোম্বাই ও করাচীর মানবের বুকে, মাদ্রাজ ও জব্বলপুরের রাজপথে।

সেই চরমদিনের জন্য পীল কমিশন' ওষুধ বাত্‌লে যান: গোরা সৈন্যের সংখ্যা বাড়াও এবং গোলন্দাজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের নিয়ে গড়ত। যেমন 'মার্শাল' ও 'নন্‌-মার্শাল রেস' এর ব্যাপার, তেমনি' পীল কমিশনের অনেক পরে সাইমন কমিশন এই গোরা সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধির নতুন সাফাই বার ক'রে গিয়েছেন: আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজন না ক'মে বেড়েই চলছে আর এ রকম ক্ষেত্রে প্রায় সব স্থলেই গোরা সৈন্যের চাহিদা দেখা যায়।...কারণ গোরা সৈন্যেরা নিরপেক্ষ; তারা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে অথবা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে সাহায্য করবে এ রকম সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। যেহেতু যে সকল ক্ষেত্রে মিলিটারীর ডাক পড়ে, তার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক বা ধর্মমূলক, তার জন্যে এমন লোককে হস্তক্ষেপ করতে হবে যাদের বাস্তব বা কাল্পনিক কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।" এই ভণ্ডামীর মুখের জবাব স্বয়ং ভারতসরকারেরই কার্য বিবরণী থেকে পাওয়া যাবে। নিচে তার কালানুক্রমিক কিছুটা নমুনা তুলে দিলাম:

"১৯২৭-২৮ : খুব আনন্দের কথা এই যে, এ বছর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য যে সব ক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল, তার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই সৈন্যদল উপস্থিত হলেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। একমাত্র খড়্গপুরের বি, এন, আর ধর্ম্মঘটের সময় বেয়নেট চালনার ফলে কয়েকজন আহত হয়। বি, এন, আর ধর্ম্মঘটের সময় ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ্চ অবধি আর্মি সিগ্‌নালার দিয়ে রেল চালু রাখতে হয়।

"১৯২৯-৩০ : এ বছর বেসামরিক কর্ত্‌পক্ষের সাহায্যের জন্যে ৩৭টি জায়গায় সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হয়। তার অধিকাংশই তথাকথিত স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী উপলক্ষে, তবে কোনরকম বিষদৃশ ঘটনা ঘটে নি।

"১৯৩০-৩১ : ৬ ব্যাটেলিয়ন পদাতিক সৈন্য বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উগ্র কেন্দ্রগুলিতে পাঠাতে হয়; পথমত রাজতন্ত্র প্রজা ও সরকারী কর্মচারীদের রক্ষার জন্য, দ্বিতীয়ত বিপ্লবী দলগুলি ও তাদের সমর্থকদের কাছে এ কথা প্রমাণ করার জন্যে যে শেষ পর্যন্ত অরাজকতা দমন করার উপযুক্ত ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট রয়েছে।

"১৯৩:-৩৩ : এ বছর বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আরও বিপজ্জনক রূপ নেয়। তাই আরও মিলিটারী আমদানি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফৌজীরা ব্যাপকভাবে 'রুটমার্চ' করছে এবং পলাতক ও সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বা'র করতে বেসামরিক কর্ত্‌পক্ষকে সাহায্য করছে।"

'৩১ সালের জানুয়ারিতে আনোয়ার রাজ্যে আন্দোলন এত তীব্র হয়ে উঠে যে, একদল গোরা সৈন্য সেখানে পাঠাতে হয়। কাশ্মীরে দেশীয় রাজ্যের ফৌজ ভার গ্রহণ করায় বৃটিশ সৈন্য সেখান

থেকে সরিয়ে আনা হয়। ভারত সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জীবন কাঠি-মরণ কাঠি সৈন্যবাহিনীর কাছে গচ্ছিত। তাই তাদের আয়ত্বাধীন সমস্ত শক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা একে "নিরাপদ" রাখবার চেষ্টা করেছে।' ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে কূটনীতি (ভেদনীতি) প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদ রাজত্ব কায়েম রেখেছে, তাকেই চতুরভাবে ব্যবহার করেছে সামরিক বিভাগে।

সেই নাগপাশ ছিন্ন করে সশস্ত্র বাহিনী আকুল আহ্বান করেছে ঃ "ভাইবোনেরা" আমাদের আহ্বানের সাড়া দাও। আমরা তোমাদের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আছি।" ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মৃত্যু-পরোয়ানা দস্তখত হয়ে গিয়েছে!

সৈন্যদল জাতীয় করণ

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভারতের আত্মা নিদারুণ ব্যাথায় ক্রন্দন করে উঠেছিল। তারপর দীর্ঘ ৯০ বছর পর অনেক বেদনা আর সাধনার মধ্যে দিয়ে আমরা রচনা করেছি আমাদের ইতিহাসের বৃহত্তম স্বপ্ন। সেদিন তাকে ইতিহাসের পরম সত্য বলে প্রতিষ্ঠিতও করেছি আমরা। কিন্তু পলাশীর বিপর্য্যয়ের পর ১৯০ বছর ইংরেজ যে শাসন চালিয়ে এসেছে তাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা আজও সে ছাড়েনি। তার কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখতে সে আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে ইংরেজের এই সব নূতন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আমরা যদি সচেতন না পাই তাহলে এই বহু আকাঙ্ক্ষাতীত ইপ্সিত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করতেও তার দেরী লাগবে না।

ইংরাজ তার রাজত্ব বজায় রেখেছিল ভারতবাসীর বন্ধুত্বের আশীর্ব্বাদে নয়—বন্দুকের জোরে। তার কামান, বন্দুক ও সৈন্য দিয়ে সে দমন করেছে এদেশের প্রত্যেকটি বিদ্রোহ ও আন্দোলন।

আজ ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তখন এটলী সাহেব বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, এ' বছরের মধ্যে সমস্ত গোরা সৈন্য এদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু যদিও গোরা সৈন্য চলে যায় তবুও ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব শেষ হবে না। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের সৈন্য বাহিনীর উপর ইংরেজ নানা ফন্দিতে নিজের আধিপত্য রাখার চেষ্টা করেছে।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির নাম করে আমাদের সৈন্য বাহিনীকেও ভাগ করা হয়েছে।

সে কাজের সম্পূর্ণ ভার পরেছে "যুক্ত দেশরক্ষা কাউন্সিলের" উপর। এই কাউন্সিলে ইংরাজ আধিপত্য সবচেয়ে বেশী। এর সভাপতি হলেন মাউণ্টব্যাটেন স্বয়ং। তাছাড়া এতে আছেন এত-দিনের কুখ্যাত ভারতের ইংরাজ সেনানায়ক অকিনলেক।

সকলেই আশা করেছিলেন দেশরক্ষার ভার যখন ভারতের হাতে এসেছে তখন সৈন্য-বাহিনীকেও জাতীয়করণ করতে দেরী হবে না। এই নীতি অনুসারে মধ্যকালীন গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন কিন্তু কিছুদিন হ'ল এ কমিটি তুলে দেওয়া হয়েছে। এর সভাপতি পণ্ডিত নেহেরু মন্তব্য করেন যে, দেশ বিভাগের ফলে বিভক্ত সৈন্যবাহিনীতে গোরা অফিসারের প্রয়োজন আছে, তাই পুরাপুরি স্বদেশী বাহিনী গড়তে দেরী হবে। এই প্রসঙ্গে অকিনলেক বলেছেন গোরা অফিসারদের এখনও অনেকদিন থাকতে হবে। এটলী সাহেবও পার্লামেন্টে চার্চ্চিলকে আশ্বাস দিয়াছেন যে ১৫ই

অগাষ্টের পরও বহু সেরা অফিসারকে ভারত ও পাকিস্থানে রাখা হবে। অথচ যুদ্ধপ্রত্যাগত বেকার অফিসারদের কাজে লাগাবার কোন চেষ্টাই হচ্ছে না।

ফলে আমরা দেখতে পাই যে যদিও ইংরাজ বলেছে যে তারা এদেশ থেকে চলে যাচ্ছে কিন্তু কার্য্যত দেখা যাচ্ছে তারা যাচ্ছে না। তাদের কর্ত্তৃত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা করছে। আমাদের ফৌজের নেতৃত্ব করবে গোরা অফিসার। আমাদের ফৌজের পুনর্গঠন হবে ইংরাজ কর্ত্তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী। অথচ তাদের উপর আমাদের কোনও হাত থাকবে না। আমাদের ফৌজের মাথার উপর থাকবে ইংরেজ পঞ্চম বাহিনী।

শুধু তাই নয়। ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেও আমাদের দেশী ফৌজ লাগাবার চেষ্টা করছে। এটলী সাহেব কি ভাবে ভারত ও পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনীকে বৃটিশ প্লানের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিচ্ছেন। তাছাড়া লর্ড মণ্টগোমারী এদেশে যখন এসেছিলেন তখন তিনি ভারতীয় অফিসারদের বিলেতে সামরিক শিক্ষা দেবার সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে গিয়েছেন।

বর্ত্তমানে ভারতীয় ফৌজে যে সব দেশীয় অফিসারদের নেতৃস্থানীয় পদে নিয়োগ করা হচ্ছে, তারা প্রায় প্রত্যেকেই খয়ের খাঁ হিসাবে নাম করেছেন। অথচ আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের কাজে লাগান হ'ল না।

একদিকে এইভাবে ভারতের জাতীয় বাহিনীর উপর ইংরেজ তার কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখবার তোড়জোড় করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্য রক্ষার কাজেও ভারতের জনবল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে।

স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কাজ সৈন্যদলে কিভাবে চলেছে, "অপারেশন এসাইলাম" তাহার প্রমাণ। ভবিষ্যতে গণ-আন্দোলনকে কিভাবে দমন করতে হবে শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের নেতৃত্বে এখন তাহার ট্রেনিং চলেছে। সৈন্যাবাস সমূহে রাজনৈতিক আলোচনা এমন কি সংবাদপত্র বা বই পড়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছে ; খানাতল্লাসী ও গোয়েন্দা নিয়োগ করে সৈন্যদের সন্ত্রস্ত রাখা হয়েছে। সর্দ্দার বলদেব সিং তাঁহার প্রথম বক্তৃতায়ই বলেছেন ঃ বর্ত্তমানে ভারতীয় সৈন্যদলে অনেক বৃটিশ অফিসার আছেন। তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করার ইচ্ছা আমাদের কাহারো নাই। তাঁহাদের পূর্ণ সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করি।

এই মনোভাব আছে বলিয়াই যে সকল বৃটিশ অফিসার প্রতিদিন সাধারণ সৈন্যদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা কাহারো নাই। সর্দ্দার বলদেব সিং বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের রক্ষক অকিনলেক সাহেবের উপর নির্ভর করে কোন কালেই ভারতীয় বাহিনীকে জাতীয় বাহিনীতে পরিণত করতে পারবেন না। সাধারণ সৈন্য ও অফিসারদের দেশ-প্রেমের উপর দাঁড়াতে না পারলে ইহাকে অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদের কবল হ'তে মুক্ত করা সম্ভব হবে না। ভারতের গণতান্ত্রপ্রিয় জনসাধারণ ও সাধারণ সৈন্যকে এক সঙ্গে দাবী করতে হবে ঃ

* জঙ্গীলাটের পদ হইতে সুরু করে লেফটেনেন্ট পর্য্যন্ত কোন পদেই বৃটিশ অফিসার নিয়োগ করা চলবে না।
* প্রত্যেক বৃটিশ সৈন্যকে এদেশ হ'তে বিদায় দিতে হবে।
* নির্ব্বিচারে সৈন্য ছাঁটাই না করে ভারতীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় সৈন্যদের স্থায়ী চাকুরী দিতে হবে।

* সৈন্যদলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নৌ-স্থল ও বৈমানিক বিদ্রোহী ও আজাদ হিন্দ সৈন্যদের এখনই পুনর্নিয়োগ করতে হবে।
* বিদেশ হতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কম্যাণ্ডার আমদানী করা চলবে কিন্তু তাঁহাদের হাতে কোন শাসন দায়িত্ব অর্পণ চলবে না।
* সাধারণ সৈন্যদের মজুরী, খাদ্য ও পোষাক প্রভৃতির উন্নতি সাধন করতে হবে।
* সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে বর্তমানে যে সকল কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে তাহা দূর করতে হবে। সাধারণ সৈন্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে হবে।

———

মতামত

……সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ের ঘটনায় আপশোষ করিয়া বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস কোন নির্দ্দেশ দেয় নাই, তথাপি ধর্ম্মঘট ও হাঙ্গামা হয় কেন? সমাজ জীবনের গভীরতর স্তর সন্ধান করিলেই তিনি ইহার সূত্র খুঁজিয়া পাইতেন। গণচিত্ত যখন নিদারুণ আলোড়ন আসে, তখন পিতার জন্য তাহারা অপেক্ষা করে না।

……ইহা ভাল কি মন্দ, হিংসা কিম্বা অহিংসা একথা চিন্তা করিবার অবসর জনসাধারণের নাই। গান্ধীজী একদা Do বা Die মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। যাহা আগষ্ট আন্দোলনে প্রতিফলিত হইয়াছে।……সুতরাং আজ গণবিক্ষোভকে একবাক্যে নিন্দা করা সমীচীন কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার মত। মানুষ মেসিন নয়, তাহার মধ্যে জীবন্ত বেগবান চিত্ত রহিয়াছে। সেই চিত্ত অভীষ্টপূর্ণ না হইলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেই। ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত এই গণবিক্ষোভ শান্ত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। সেই স্বাধীনতা দ্রুততর করিবার জন্যই নেতৃবৃন্দের সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার। সেই মহৎ ব্রত পালনই বিচ্ছিন্ন হিংসার অবসান হইবে।

—**যুগান্তর ২৮।২।৪৭**

......The rising of the Indian Navy in February 1946 laid bare in a flash all the maturing forces of the Indian Revolution. The memories of the 'Potemkin' in Russia in 1905, of 'Krosntadt' in Russia in 1917 or Kiel in Germany in 1918 have all deeply impressed the significance of the Navy in the vangurd of great revolutions. The Naval rising in February, 1946, the mass movement of support within India and the heroic stand of the Bombay working people constituted the signal of the new era opening in India and one of the great land marks of India History. In those February days the friends and foes of Indian Popular advance stood revealed......It slowed on the one hand the height of the movement the courage and determination of the People and the overwhelming mass support for Hindu moslem unity and Congress League Unity. It showed that the movement had reached to the armed forces and that there fore the basis of British rule was no longer secure. But it showed on the other hand, the unreadiness and disunity of the existing national leadership and their consequent inability to lead the national struggle.

[R. P. Palme Dutt's "India to day.". p. p. 473]

......আমাদেরও প্রয়োজন আছে এই ঘটনা হইতে আমাদের শিক্ষালাভ করিবার। রাজনৈতিক আদর্শের যে সমগ্র স্বীকৃতি এই নাবিকগণ রক্তাক্ষরে লিখিয়া গেল আমাদেরও তাহা অনুধাবন

করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকটেই তাহাদের আবেদন আসিয়াছিল। তাহাদের সংগ্রাম ও ত্যাগে নেতৃবৃন্দের জন্যও শিক্ষা রহিয়া গেল। বিদেশী প্রভুত্ব হইতে মুক্তির দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিল। তাহাদের ত্যাগ ব্যর্থ হইবে না। আমরাও যেন তাহাদের নিকট হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বিফল না হই।

—"আজাদ" ৩৬।২।৪৬

নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহের ভিতর রাজনীতির গন্ধ পাইয়া অচিন-লেক সাহেব কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"রাজনীতির সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; সৈন্য বিভাগে আমি রাজনীতির কোন কথা প্রবেশ করিতে দিব না।" সামরিক বিভাগের সহিত যদি রাজনীতির সম্বন্ধ না থাকে এবং কেবলমাত্র ভারতবর্ষকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই যদি এদেশের সমর বিভাগের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এদেশে অর্থের অপ্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও এত গোরা সৈন্য রাখিবার কারণ কি?

…বিগত যুদ্ধের সময় যখন এদেশের লোককে স্বদেশরক্ষা ও গণতন্ত্রের নামে সৈন্যবিভাগে ও নৌ-বিভাগে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন অচিনলেক বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন যে, সমর বিভাগের ভিতর হইতে রাজনীতি বাদ দেওয়া যায় না। সৈন্য বিভাগে বা নৌ-বিভাগে যাহারা ভর্ত্তি হইয়াছে তাহারা ত আর কাঠের পুতুল নয়। তাহারা ইংরেজের মতই রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ। তাহাদের মনে ঠিক ইংরেজের মতই

স্বাধীনতাস্পৃহা বর্তমান এবং তাহারা বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করিতেছে বলিয়াই যে তাহাদের মন হইতে স্বাধীনতাস্পৃহা লোপ পাইবে, এরূপ আশা করাই অযৌক্তিকতা। নিয়মানুবর্ত্তিতার দোহাই দিয়া সে স্বাধীনতাস্পৃহা দমন করিতে গেলে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

—"বসুমতী" ২৭।২।৪৬

The whole country has read with the deepest humiliation of British Troops firing on the India ratings and of the Royal Navy beeing called out to crush the R. I. N. if necessary. It has also been our lot to be lectured by apologists of the Imperialist Power. Mutiny in a fighting service is intolereble, they say ; a National Goverment would find if so, they conclude. They forget that there would be no cause for muting under a national Goverment, for if there were, if would bad to the fall of the Goverment rather that the destruction of the Navy.

There can not be any peace unless we have our national navy and that is part of the Congress Question of Independence which is to be solved, not by sporadic attempts here and there but by one gigantic final effort under the direction of the national leaders. That day may not be very distant.

MORNING NEWS. Feb, 24. 1946.

* * * বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই নৌ-বিদ্রোহ হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিবেন কি যে, যুদ্ধের আদর্শ বলিয়া তাঁহারা যাহা ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে যত ফাঁকিই থাকুক, তাহাই আজ সমগ্র প্রাচ্যের জনগণের মধ্যে তথা ভারতের জনগণের মধ্যেও সাম্য এবং স্বাধীনতার বাণীর অকারে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতের সৈন্যগণ ভারতীয়ত্বের চেতনা বিস্মৃত হইয়াই চিরকাল বৈষম্য বেদনা নীরবে সহিয়া যাইবে; ৪০কোটি ভারতবাসীর মনে আজ যে আশা আকাঙ্ক্ষা, যে জাতীর মর্য্যাদাবোধ সচেতন ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের সৈনিকগণের মধ্যেও তাহাই ক্রিয়া করিতেছে। নৌ-বিদ্রোহীরা "জয়হিন্দ্" লিখিয়াছে, নেতাজীর প্রতিকৃতি তুলিয়া ধরিয়াছে, আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবী করিয়াছে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছে—ইহা বৃটিশের নিকট যতই অবাঞ্ছিত ও ভয়াবহ মনে হউক; ভারতের ক্ষেত্রে আজ ইহাই স্বাভাবিক, ইহা যেমনই ব্যাপক তেমনি অপ্রতিহত।

কালের ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া কংগ্রেসের মধ্যস্ততায় নৌ-বাহিনীর দাবী সত্বর পূর্ণ করুন এবং প্রভুত্ব ত্যাগের এই অমোঘ বিধানের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে প্রস্তত হউন।

—আনন্দবাজার

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ সাম্রাজ্য-বাদের আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করিয়াছে। ১৯২০-২১সালের অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবাসীর জেলের ভয় চলিয়া যায়, তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে উল্লেখ-যোগ্য চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই।

১৯৩০-৩২ সালে লাঠি ও গুলীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। এই ১৯৩০-৩২সালেই কয়েক জায়গায় ভারতীয় সৈন্যরা দেশবাসীর উপর গুলী চালাইতে অস্বীকার করে। ১৯৪২সালে ভারতবাসীর প্রতিরোধ আন্দোলন অহিংসার গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া আসে। ১৯৪৫-৪৬সালে জনসাধারণ সংঘবদ্ধভাবে মিলিটারির বিরুদ্ধেও দাঁড়াইয়াছে। এই যুগে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্য হইতে একটির পর একটি অংশ দেশবাসীর মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। জাতীয় নেতাদের আহ্বান আসিলে ১৯৪৬সালে সৈন্য ও জনসাধারনের অপরাজেয় অভ্যুত্থানে সাম্রাজ্যবাদ ধুলায় মিশিয়া যাইত।

নৌ-বিদ্রোহ সেই বিপ্লবেরই সংকেত।

—"স্বাধীনতা"

মস্কো বেতার

২৪শে ফেব্রুয়ারী মস্কো বেতারের ভাষ্যকার ভিকট্রভ বলেন; ভারতে নাবিকদের বিদ্রোহ আজ হঠাৎ পৃথিবীর সংবাদপত্রের পাতা ভরাইয়া দিতেছে। এই বিদ্রোহ যে ঘটিয়াছিল ইহাই অনেক কিছু প্রকাশ করে। ভারতের জনসাধারণ যে আর পুরাতন অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহে না—তাহারা নবজীবন চায় একথা বুঝিবার জন্য আজ আর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের দার্শনিক বা ভাল ছাত্র কিছুই হইবার দরকার করে না। তবু আজো ভারতবাসীকে পুরাতন ধারায় চালাইবার জন্য যে কঠোর চেষ্টা চলিতেছে—তাহারই ফলে এই সব সংঘর্ষ হইতেছে।"

ডেলী ওয়ার্কার

বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র ডেলী ওয়ার্কার পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছে, ভারতের বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ বিরাট বিক্ষোভ প্রভৃতির দ্বারা যে গণ-আন্দোলনের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ তাহার সর্ব্বোচ্চপ্রকাশ, ভারতবর্ষ "স্বাধীনতা" চায়। বৃটিশ সরকার এই সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিতেছেন তাহার মধ্যে শুধু ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে চিরস্থায়ী করিবার অপকৌশল ভিন্ন ভারতবর্ষ আর কিছুই দেখিতে পায় না।

প্যারিসয়ার

ফ্যান্সের পত্রিকা "প্যারিসয়ার" "বৃটিশ সাম্রাজ্যে ঝড়" শিরোণামা দিয়া মন্তব্য করেন: তাহাদের (নৌ-সৈন্যদের বিদ্রোহের) আশু কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহার দ্বারা তাঁহাদের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষাকে বলপ্রয়োগ করিয়া কেবলমাত্র সামরিক ভাবেই দমন করা কর্ত্তব্য।

নিউইয়র্ক টাইমস্

নিয়ইয়র্ক টাইমস্ "বিদ্রোহ ও বুভুক্ষা" শিরোণামা দিয়া বলেন:

ভারতীয় নাবিকদের বিদ্রোহ ভারতে বৃটিশ মন্ত্রীসভা প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।"

* * * * * * * * *

* * * ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লোকরা অহিংসা কি তাহা যদি জানেন এবং বুঝিতে পারেন, প্রতিরোধের পন্থা মর্য্যাদা সম্পন্ন,

পুরুষোচিত এবং সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে আর ব্যক্তিগত অহিংস, প্রতিরোধ হইলেইত হইবেই। চাকরী যদি তাঁহাদের নিকট বা ভারতের পক্ষে অমর্য্যাদাকর হয়, তবে তাহারা চাকুরী করেন কেন? এই রকম কাজকে আমি অহিংস অসহযোগ আখ্যা দিয়াছি। তাঁহারা ভারতের পক্ষে খারাপ এবং অযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। হিংসা কার্য্যের জন্য হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্যের মিলন অপবিত্র এবং ইহার পরিণাম পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা ইহা ভারত ও পৃথিবীর পক্ষে অশুভ।

—মহাত্মা গান্ধী ২৩।২।৪৬, পুনা।

* যাহাতে এই সকল নাবিক ধর্ম্মঘটীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করিয়া ইহাদের প্রতি সুবিচার করা হয় তদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের মোছলেম লীগ দল যথাশক্তি চেষ্টা করিবে।

—নবাবজাদা লিয়াকৎআলি—(আজাদ ২৫।২।৪৬)

—শেষ—